বাংলার চিত্রকলা: গতি ও দুর্গতি

দ্রাবিড় সৈকত*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ : 'বাংলার চিত্রকলা' বিষয়টির বিস্তার ও পরিধি ব্যাপক হলেও এর অর্থচ্যুতি ঘটেছে ঐতিহাসিক নানা পর্যায়ে। আমাদের বিদ্যায়তনিক ইউরোপীয় চিত্রচর্চার ধারার সাথে প্রতিযোগিতার প্রতিকূল পরিবেশে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ায় এবং নান্দনিক বিবেচনার পশ্চিমি মানদণ্ডের উপস্থিতি ও প্রাক-ঔপনিবেশিক শাস্ত্রীয় সূত্রাবলির অনুপস্থিতিতে 'বাংলার চিত্রকলা'কে বিবেচনা করা যায় চরম অবহেলিত প্রকরণ হিসেবে। 'বাংলার চিত্রকলা'র প্রকৃত অবস্থা আর বর্তমান পরিণতিকে একটি সারণিতে দাঁড় করিয়ে দেখে নেয়া যেতে পারে এর প্রকৃত রূপ ও বাহ্যিক অবয়বের ফারাক। প্রাচীন বাংলার চিত্রধারার সাথে বর্তমানে প্রচলিত 'বাংলার চিত্রকলা' তথা 'বাংলার লোকচিত্রকলা'র সামঞ্জস্য ও বৈসাদৃশ্যগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বুঝে নেয়া যেতে পারে 'বাংলার চিত্রকলা'র গতিপথ কোথায়, কখন, কিভাবে বদলে গেল, কিংবা সুপ্রাচীনকাল থেকেই কি এমন ধারায় চলে এসেছে বাংলার চিত্রচর্চা? বিভিন্ন দালিলিক উপকরণ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণে উন্মোচিত হতে পারে 'বাংলার চিত্রকলা'র অকৃত্রিম রূপ-বিন্যাস। ইউরোপের অনুকরণ 'বাংলার চিত্রকলা'র পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রগতি না অধোগতি এবং তার ভবিষ্যৎ কী? এসব প্রশ্নের সদুত্তর অনুসন্ধানের পাশাপাশি প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো এই বিবেচনাগুলোকে সামনে রেখে 'বাংলার চিত্রকলা'র স্বরূপ অন্বেষণ।

চাবিশব্দ: বাংলা, রেখা, মানবদেহ, দেহাত্মবাদ, লোকশিল্প।

Abstract: Although the scope of the 'Bengal painting' is wide, its meaning has been shifted over time, historically. 'Bengal painting' can be considered as a neglected topic because of both the adverse environment of competition with European standard of painting and absence of the pre-colonial textual formulas. The comparison of the real state and current outcome in a table can present the differences between actual form and external appearance of 'Bengal Painting'. The course of 'Bengal painting' can be understood by analyzing the similarities and differences between the style of ancient Bengali painting and the current 'Bengal painting' or 'Bengal folk art' which can help us to know 'where, when and how the course has been

* সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
ই-মেইল: saikot81@gmail.com

changed' and whether Bengali painting has such a trend since the ancient period of time. The genuine form of 'Bengal painting' can be revealed through exploring various documentary materials, socio-cultural, philosophical-psychological and political-economic facts. Does the imitation of European style in the context of Bengal Painting indicate a progress or decline and what is its future? Along with answering such questions and keeping aforementioned matters in consideration, this article sets its major purpose to explore the scope and nature of 'Bengal painting'.

গবেষণা কাঠামো

আলোচ্য প্রবন্ধে 'বাংলা', 'বাঙালি' ও 'বাংলার চিত্রকলা' বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত কিছু সাধারণ ধারণাকে উপস্থাপন করে বিভিন্ন দালিলিক উপকরণ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের মাধ্যমে এদের বৈশিষ্ট্যগত সমস্যাকে চিহ্নিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। পাঠ/আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির (Content Analysis Method) অনুসরণে উক্ত বিষয়াবলির সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্বাচিত চিত্রকর্মসমূহে নব-পরিচয়জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহের মূল টেক্সট বা পাঠ-বিশ্লেষণপূর্বক গবেষকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণকেও তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কিছু ক্ষেত্রে তাই বর্ণনামূলক পদ্ধতির (Descriptive Method) অনুসরণ পরিলক্ষিত হবে।

লিটারেচার বিভিয়্যু

আলোচ্য প্রবন্ধে 'বাংলার চিত্রকলা' বলতে সামগ্রিক ধারণা হিসেবে 'বাংলার লোকচিত্রকলা'কে বোঝা-পড়ার যে সমস্যা, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ যাবৎ প্রকাশিত বাংলার চিত্রকলা বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ বা প্রবন্ধসমূহে এই সমস্যাটি সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে এমনটি দেখা যায়নি। যেমন অশোক ভট্টাচার্যের *বাংলার চিত্রকলা*, অশোক মিত্রের *ভারতের চিত্রকলা*, শোভন সোম ও অনিল আচার্যের *বাংলা শিল্প সমালোচনার ধারা*, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের *ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা*, গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের *প্রাচীন শিল্প পরিচয়*, দেবপ্রসাদ ঘোষের *ভারতীয় শিল্পধারা ও বৃহত্তর ভারত*, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *লোকশিল্প বনাম উচ্চ মার্গীয় শিল্প*, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রচনাবলী*, নন্দলাল বসু এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখক-পণ্ডিতগণের রচনায় কিংবা লোকশিল্প বিষয়ক রচনাবলি যেমন, গুরুসদয় দত্তের *বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য*, আশুতোষ ভট্টাচার্যের *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, ওয়াকিল আহমেদের *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের *বাংলাদেশের লোকশিল্প* ইত্যাদি গ্রন্থাবলিতে শিল্প এবং লোকশিল্পকে আলাদা করে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু একটি জাতির জাতীয় শিল্পকলার চরিত্র কিভাবে 'লোকশিল্প' হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে এ বিষয়ে কোনো

পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়নি। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলার শিল্পকলা কিভাবে লোকশিল্পের অপর নাম হয়ে উঠলো তারই একটি পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

'বাংলা' শব্দটি দিয়ে কি বোঝানো হবে এ বিষয়ে বিবিধ ঐতিহাসিক কারণে কিছুটা ধোঁয়াশাচ্ছন্নতা রয়েছে। কাজেই 'বাংলা' বলতে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে সে বিষয়টি প্রথমত পরিষ্কার হওয়া দরকার। বাংলা, বঙ্গ কিংবা বাঙ্গালা ইতিহাসের নানা সময়ে বিস্তৃত অঞ্চল, জাতিগোষ্ঠী, ভাষাগোষ্ঠী ইত্যাদিকে বুঝিয়েছে। আমরা 'বাংলা' বলতে মূলত একটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে বোঝাবো। এখানে রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত অথবা প্রাচীনকালে বিভিন্ন নামে পরিচিত বাংলা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বরং প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বৃহৎ প্রায় সমধর্মী অঞ্চলকে আমরা 'বাংলা' নামে অভিহিত করতে চাই। নীহাররঞ্জন রায় যার সীমানা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয়ধৃত নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগনা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমাবিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাঙলার গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দী-রাঢ়-সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদীবিধৌত বাঙলার গ্রাম, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি। একদিকে সু-উচ্চ পর্বত, দুইদিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য–ইহাই বাঙালীর ভৌগোলিক ভাগ্য। (রায়, ১৪১৬, পৃ. ৭০-৭১)

এই ভৌগোলিক সাম্য বাংলা অঞ্চলকে গড়ে তুলেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে, যা ভারতবর্ষের ভেতরে থেকেও নিজস্বতা বজায় রেখেছে। 'বাংলার চিত্রকলা'কে চিহ্নিত করতে হলে আমাদের বৃহৎবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চিত্রকলার প্রবণতাকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে। এই অঞ্চলের ভূমি-সন্তানেরা যে ধরনের ছবি এঁকেছে, চিত্র রচনা করেছে তাই 'বাংলার চিত্রকলা'। প্রশ্ন হচ্ছে বাংলার চিত্রকলাকে আলাদা কী এমন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা যায়, যা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের চিত্রচর্চার পরম্পরা থেকে আলাদা? এই অঞ্চলের চিত্রকলার মৌলিক বিষয়গুলো নির্ধারণ করাই প্রথম কাজ।

বাংলার চিত্রকলাকে আলাদাভাবে পাঠ করতে গেলে যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তা শুধু চিত্রচর্চার সমস্যা নয় বরং বাঙালির যাপিত জীবনের অন্যান্য সকল বিষয়ের ইতিহাসেই কমবেশি একই সমস্যা। অধিকাংশ ঐতিহাসিক বাংলা বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই এর ভূমি নিয়ে আলোচনা করেন, এবং সিদ্ধান্তে আসেন যে বাংলার ভূমি অপেক্ষাকৃত নতুন, অতএব এখানে সৃষ্ট সবকিছুই অনেকটা অর্বাচীন। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো মানব সভ্যতার যাত্রার শুরুই পৃথিবীর ইতিহাস সাপেক্ষে নবীনতর। কাজেই

আলাদাভাবে ভূমির নতুনত্বের দিকে মনোনিবেশের অর্থ হলো মূল বিষয়কে অনেকটাই ভিত্তিহীন করে তোলার প্রয়াস। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাংলাদেশের প্রত্নাশ্মর অথবা প্রস্তর যুগের সর্ব্বাপেক্ষা ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে শুশুনিয়া পাহাড়ে। আবিষ্কারক শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের মতে অন্তত প্রায় এক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে শুশুনিয়া গিরির পাদদেশে এবং সন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে আদিম মানবের জীবনযাত্রার লীলাভূমি ছিল।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪১৬, পৃ. ৯)। আমরা জানি বঙ্গভূমি মানব-সভ্যতা যাত্রা শুরুর সুদীর্ঘকাল আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। নদীবিধৌত অঞ্চল হওয়ায় যে ভাঙাগড়ার খেলা তাও বঙ্গ ও বাঙালির জীবনে নতুন কোন ঘটনা নয়। তাই বঙ্গভূমি অপেক্ষাকৃত নতুন একথাটি শুধু অর্থহীনই নয়, বরং বাঙালি জাতিকে একটি শেকড়হীন জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টার অংশ। কেননা ভৌগোলিক গঠনের প্রমাণিত ইতিহাস থেকে আমরা জানি:

> বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ। ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাঙলা দেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্লাওসিন যুগে (প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে) পৃথিবীতে নরাকার জীবেরও বিবর্তন ঘটে এই প্লাওসিন যুগে। [...] সেই প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ যে বাঙলাদেশে বাস করে এসেছে, তার প্রমাণ আমরা পাই বাঙলাদেশে পাওয়া তার ব্যবহৃত আয়ুধসমূহ থেকে। (সুর, ১৯৮৬, পৃ. ২০)

পৃথিবী জুড়ে মানব-প্রজাতির বিভিন্ন শাখা আলাদা আলাদা সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। মধ্য-ভারতের ভীমবেটকা গুহায় প্রত্নমানুষের প্রায় লক্ষ বছরের পুরোনো বসতির সন্ধান পাওয়া যায়। মানব-বিবর্তনের প্রাচীন থিওরির সমস্যা হলো তাতে বলা হতো পৃথিবীর সকল মানুষ একই জায়গা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং সভ্যতাকেও তার ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করা হতো। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে পৃথিবীব্যাপী আলাদাভাবেই মানুষের বিস্তার হয়েছে। আবার মিশ্রণের মাধ্যমেও তৈরি হয়েছে নতুন সংকর:

> বিজ্ঞানীরা আরও একমত হন যে, ৭০ হাজার বছর আগে পূর্ব আফ্রিকা থেকে স্যাপিয়েন্সরা আরবীয় উপদ্বীপ অঞ্চলে এসে পৌঁছে এবং সেখান থেকে দ্রুত গোটা ইউরেশিয়ার স্থলভাগে ছড়িয়ে পড়ে।
>
> হোমো স্যাপিয়েন্সরা যখন আরবে এসে পৌঁছায় তখন ইউরেশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলেই অন্য প্রজাতির মানুষেরা বসবাস করছিল। [...] স্যাপিয়েন্সরা মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে পৌঁছে মুখোমুখি হয় নিয়ান্ডারথালদের। [...] একই রকমভাবে যখন স্যাপিয়েন্সরা পূর্ব এশিয়াতে পৌঁছে, তখন তারা প্রজনন ঘটিয়েছিল স্থানীয় ইরেক্টাসদের সাথে। ফলে বর্তমান চীনা এবং কোরিয়ানরা হয়ে দাঁড়ায় স্যাপিয়েন্স ও ইরেক্টাসের সংকর। (হারারি, ২০১৯, পৃ. ১৬)

বাংলা অঞ্চলে কত প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বসতি গড়েছে তার সঠিক উপাত্ত এখনও নিশ্চিতভাবে পাওয়া না গেলেও এর প্রাচীনতা নিয়ে পূর্বধারণার বশবর্তী হয়ে সন্দেহ পোষণ অনেকটাই অজ্ঞতাপ্রসূত এবং একদেশদর্শিতার নামান্তর। আরেকদল ঐতিহাসিক নামকরণের ধোঁয়ায় আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখেন। 'বাংলা' নামটা ঠিক কবে থেকে প্রচলন হলো, এর উৎস কোথায়, কোন কোন অঞ্চল এই নামের আওতাভুক্ত ছিল অথবা আছে, কত খণ্ডে বিভক্ত ছিল বঙ্গভূমি, কারা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলো অথবা শাসক সম্প্রদায়ের

নামের তালিকা প্রণয়নসহ তথ্যের অতিকথনও আমাদের বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অনেকটা কমগুরুত্ববহ আলোচনাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। 'বাংলা' নামের বিষয়েও আমরা অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে মূল বিষয় থেকে অন্যত্র দৃষ্টি সরিয়ে নিতে প্রস্তুত নই। কেননা আমরা শুরুতেই বলে নিয়েছি আমাদের বাংলার অর্থ 'বৃহৎবঙ্গ'। নামকরণের ইতিহাস যাই হোক না কেন, অতীতে এই অঞ্চলের নাম যাই থাকুক না কেন বর্তমানে 'বাংলা' নামকেই আমরা এই বৃহৎ ভূ-ভাগের পরিচয় হিসেবে চিহ্নিত করি। এই অঞ্চলের চিত্রকলা তাই 'বাংলার চিত্রকলা'। এখানে চিত্রচর্চার ইতিহাসও অতি প্রাচীন:

> ঊষা অনিরুদ্ধের উপাখ্যান থেকে আমরা জানতে পাই যে মহাভারতের যুগেও এখন যাকে বলে প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট তার বেশ চলন ছিল, তা না হলে নেতি নেতি করে ঊষা সব দেবদেবীর আঁকা ছবি একে একে বাদ দিয়ে শেষকালে অনিরুদ্ধের পোর্ট্রেটে স্বপ্নে দেখা আরাধ্যকে চিনলেন কি করে? রামায়ণেও রাম সীতার আলেখ্য দর্শনের কথা আমরা পড়ি। কিন্তু বৌদ্ধ যুগে চোখের দেখা চেনা বা হুবহু-স্বাভাবিক দৃশ্য আঁকা, অথবা পোর্ট্রেট আঁকার রেওয়াজ গেল কমে, এল ধর্ম বিষয়ক চিত্র। তার থেকে হল ছবি আঁকা সম্বন্ধে আস্ত একটা দর্শনের সৃষ্টি, যার সন্ধান আমরা পাই বিনয়পিটকে, যেখানে চিত্রঘরের উল্লেখ আছে। সতেরো শতকের তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের একটি ছোট ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আছে। তাতে তিনি বলেছেন যে ভারতে চারুশিল্পের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন, ভগবান বুদ্ধেরও আগের। (মিত্র, ২০০৮, পৃ. ৫৪)

বাংলা অঞ্চলে চিত্রচর্চার সংস্কৃতি যে বেশ প্রাচীন এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে চিত্রচর্চার করণকৌশল নিয়ে রয়ে গেছে অনেক মতবিরোধ। বাংলার চিত্রকলা বলে আমাদের সুপরিচিত ঐতিহাসিকগণ যে সব চিত্রকর্মের নমুনা সামনে হাজির করেছেন তা আসলেই বাংলার চিত্রকলা কিনা? অথবা বাংলার চিত্রকলা বলে লোকশিল্পের যে সমস্ত বিষয়াদিকে বোঝানো হচ্ছে বাংলার চিত্রকলার রূপ কি শুধুই এমন লোকশিল্পের গড়নে তৈরি? এমন প্রশ্নগুলোর যথার্থ জবাব পাওয়া জরুরি। গুরুসদয় দত্ত যেমন বলেন:

> চিত্র-রসকলায় বাঙ্গালী প্রাচীনযুগে যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষকে নয়, সমগ্র এশিয়াকে অনুপ্রাণনা বিতরণ করিয়াছে, তাহার উপলব্ধি আজকালকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর নাই। নিজস্ব সম্পদ-বিহীনতার ভ্রান্ত বিশ্বাসের দৈন্যে প্রপীড়িত শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ বিশ্ব রসকলার হাটে, দীন ভিখারীর বেশে–অজন্তার ভগ্ন গুহাদ্বারে–মোঘল ও রাজপুত প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে, চীন, জাপান ইত্যাদি ও ফ্রান্সের বস্তু-বেরঙের বিপণির দ্বারদেশে–ভিক্ষুক। (দত্ত, ২০০৮, পৃ. ১৮১)

গুরুসদয় দত্তের এই উপলব্ধির যথার্থ মূল্য রয়েছে, বৃহৎবঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলে শিল্প-সাহিত্য, মননশীলতার চর্চাও হয়েছে বিস্তর এবং ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলই বাংলার সাথে নানাবিধ সম্পর্কে সম্পর্কিত। এ অঞ্চলের সওদাগর-বণিকেরা পৃথিবীব্যাপী তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রভাশালী চরিত্র হলো সওদাগর। আমরা জানি সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলা অঞ্চলে উর্বর পলিমাটি ও জলের সহজলভ্যতার কারণে কৃষির বিস্তার

ঘটেছিল, উপার্জন-কর্মের অবসরে বাঙালির ছিল মননশীলতা চর্চার সুযোগ। একই সাথে বাঙালি ছিল পৃথিবীর অন্যতম কাঙ্ক্ষিত বস্ত্র মসলিনের উৎপাদক। তাছাড়া তামা-কাসা-কাঠ-পোড়ামাটির গৃহস্থালি ও সৌন্দর্যবর্ধক দ্রব্যাদি তৈরির দক্ষতা ছিল এই অঞ্চলের মানুষের। প্রচুর রপ্তানি হতো চিনি, আদা, তুলা, মশলা, মধুসহ অন্যান্য কৃষি ও শিল্প-পণ্য। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে তাকে বেড়িয়ে পড়তে হতো দেশে বিদেশের নানা অঞ্চলে। জলপথ ছিল প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম, আর বাংলাকে জড়িয়ে রেখেছে অসংখ্য নদ-নদী; তাই যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত। এভাবে তার সকল শ্রেষ্ঠ সম্পদই ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতবর্ষ, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন শহর-নগর-বন্দরে। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের রোমান কবি ভার্জিলের (৭০-১৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) *জর্জিকাস* (২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) কাব্যেও পাওয়া যায় গঙ্গা-রাঢ়ের বাঙালিদের শৌর্যবীর্যের কাহিনি, "[...] on it's doors I will have carved in gold and solid ivory images of battle, of the Ganges, and the all-conquering regiments of Romulus [...]." (Virgil, 2006, p. 50)। সুতরাং বাংলার চিত্রকলাকে অন্যান্য অঞ্চল থেকে একেবারে আলাদা কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগও অল্পই। বাংলার ধর্ম ও দর্শন বিশ্লেষণেও দেখা যাবে সর্বভারতীয় বিস্তারে বাংলার অগ্রগামিতা রয়েছে। প্রাচীন ভারত তথা বঙ্গীয় অঞ্চলে পরিপুষ্টি লাভ করা লোকায়ত অথবা চার্বাক ছিল এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্যপূর্ব প্রধানতম দর্শন ধারা। যার ফলে বৈদিকদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল চার্বাক অনুসারীগণ, যারা মূলত বাস্তববাদিতায় পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বাংলার চিত্রধারায় এই বাস্তববাদিতার ছাপ বেশ স্পষ্ট। বাস্তবকে সরিয়ে দিয়ে অধ্যাত্মবাদে আত্মসমপর্ণের ঘটনা ইতিহাসের অনেক পরবর্তীকালের বিষয়। তন্ত্র ছিল বাংলার আদি মতাদর্শ। তন্ত্রকে ঘিরেই বাংলায় বিস্তার ঘটেছে অন্যান্য সাধনার। বাংলার মানুষের মানসকাঠামো তন্ত্রের বিষয়-বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে খুব একটা বোঝা যাবে না। তন্ত্র-সাধন বা দেহাত্মবাদের বাইরে, চিত্রকলার ভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি শরীর-সংস্থানিক জ্ঞানের বাইরে পৃথিবীকে বাঙালি-মনন বিবেচনার বিষয় মনে করেনি। দেহকে কেন্দ্রে রেখেই তার যাবতীয় শিল্পের কর্মযজ্ঞ পরিচালিত (চিত্র নং-১)। বাংলা অঞ্চলের চিত্রকলায় তাই মানবদেহের প্রাধান্য ও ব্যাপক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র নং-১: অজন্তার দেয়ালচিত্র

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তন্ত্র সাধনার গূঢ়ার্থকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "প্রকৃতির সকল গুপ্ত শক্তি-সমূহের সহিত দেহের গুপ্ত বা সম্মূঢ় শক্তির কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বা কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায়, ইহা যে সাধনার ফলে জানা যায় বা আয়ত্তগত করিতে পারা যায়, তাহাই তন্ত্রসাধনা। এই তন্ত্রসাধনার মূল হইল দেহতত্ত্ব।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৮২)। দেহকে কেন্দ্রে রেখেই তন্ত্র তথা জীবন-সাধনায় বাঙালির অভ্যস্ততা সুপ্রাচীনকালের। মানবদেহের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগতির জন্য সাধনার আকার-প্রকারেও ঘটেছে বিস্তর বৈচিত্র্য। এই বাঙালি যখন ছবি আঁকতে গিয়েছে তখনো তার ধ্যানে প্রথম এসেছে শরীর এবং তার রহস্যময় উপস্থিতি। "তন্ত্র পুরো প্রকৃতিকে অবলোকন করেছে দেহের মধ্যে। প্রাকৃত দেহের বাইরে তন্ত্র কোনো অপ্রাকৃত চেতনার খোঁজ করেনি। [...] তন্ত্র-সাধনা আসলে দেহ-সাধনার মধ্য দিয়েই প্রকৃতির পরিচর্যা।" (সরকার, ২০১০, পৃ. ১৬)। প্রকৃতি ও পৃথিবীর অন্যান্য বিষয়াবলির সাথে যোগাযোগ এবং নানাবিধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাঙালি মানস একে নিজের শরীর দিয়েই অনুভব করেছে। যার ফলে তার কাজেকর্মে একাত্মতা ও একাগ্রতা অনেক বেশি। তন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ উৎপাদন সম্পর্কিত। তন্ত্র-সাধনের বিবিধ পদ্ধতি দেখা যায় ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে:

> তন্ত্র সম্পর্কে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই একটা অলীক ধারণা আছে, যা অপনোদনের জন্যই জানা প্রয়োজন তন্ত্র বলতে আসলে কি বোঝায়। কারিগরী বিদ্যা, কৃষি, পশুপালন, বয়নশাস্ত্র, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, শল্যবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বৈষয়িক জ্ঞানই তন্ত্রের আদি বিষয়বস্তু। (ভট্টাচার্য, ২০০৯, পৃ. ৪২)।

তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতির অন্যতম অংশ যোগ। যা বাংলার লোকায়তিক ধারার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তন্ত্র-যোগ-সাংখ্যের বিস্তারের সাথে সাথে বাংলার চিত্রকলাও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তান্ত্রিক চিত্রচর্চার আলাদা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারাও তার স্বমহিমায় উজ্জ্বল। কাজেই শিল্প তথা চিত্রকলার বিস্তারও একই রকমভাবে হবার অনুধাবনটির যৌক্তিক ভিত্তি আছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই উদ্ধৃত করা যায় আহমদ শরীফের মতামত:

> সাংখ্য ও যোগ–এই দুই শাস্ত্র ও পদ্ধতি যে আদিম অনার্য দর্শন ও ধর্ম তা আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না। এ শাস্ত্র অস্ট্রিক কিংবা বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিরাত জাতির মনন-উদ্ভূত, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। [...] আর্যোত্তর যুগে যে এর সর্বভারতীয় তথা এশীয় বিস্তার, তা এক রকম সুনিশ্চিত। [...] মনে হয় আর্য-পূর্ব যুগেই সাংখ্যদর্শন ও যোগপদ্ধতি সর্বভারতীয় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ কারণেই সম্ভবত ময়েনজোদাড়োতেও যোগী-শিবমূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি। ... এই যোগই শিব-সম্পৃক্ত হয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক, নাথপন্থ, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া [এ স্তরে শিব-উমার পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণ প্রতীক গৃহীত] মতরূপে যেমন বিকাশ পেয়েছে, তেমন সূফীমত সংশ্লিষ্ট হয়ে বাঙলার সূফীমত গড়ে তুলেছে। [...] আজীবিক, জিন, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, সন্ত, ফকিরও যৌগিক সাধনাকে অবলম্বন করে বৈরাগ্যবাদকে আজো চালু রেখেছে। (শরীফ, ২০০৮, পৃ. ৭৯)

আদি অনার্য বাংলার সাংখ্য-যোগ ও তন্ত্রের সর্বভারতীয় এবং এশীয় বিস্তারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশক। এই বিস্তারের ধরন-প্রকরণে সূত্র, সাহিত্য, মন্ত্র যেমন ভূমিকা রেখেছে, তেমন করেই চিত্র-ভাস্কর্যের ভূমিকা থাকাও এক প্রকার নিশ্চিত। কেননা তন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তান্ত্রিক মন্দির-স্থাপত্য নির্মাণে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ছিল প্রত্যক্ষ ভূমিকা। ভারতবর্ষ জুড়েই আমরা তান্ত্রিক চিত্রকলা, ভাস্কর্য, মিথুন মূর্তির প্রাচুর্য দেখতে পাই। তন্ত্র-সাধনের পদ্ধতি হিসেবে এবং অনুসারীদের সহজবোধ্যভাবে হৃদয়ঙ্গমের সুবিধার্থে ব্যবহৃত চিত্রকলার নজিরও পাওয়া যায় পর্যাপ্ত। যোগ-সাধনার বিভিন্ন আসন ও মুদ্রার সচিত্র বিবরণীও দুর্লভ নয়। সরাসরি চিত্রকলার ব্যাপক উদাহরণ না পাওয়ার কারণ এর মাধ্যমগত সীমাবদ্ধতা, কিন্তু এই বিবেচনা চিত্রশিল্পের অনুরাগী মাত্রেরই আছে যে, একটি ভাস্কর্য নির্মাণের আগে শিল্পীকে খসড়া করতে হয়। যে শিল্পী খসড়া রচনায় পারদর্শী তিনি অন্তত ভাস্কর্যের প্রয়োজনে হলেও খসড়া রচনা করেননি এমন কথা নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই। প্রথম দিকে ঔপনিবেশিক গবেষকদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণে মনে করা হতো ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চিত্রকলায় বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের নির্মাণ-কৌশল একটি অপরটি থেকে পুরোপুরি আলাদা। কিন্তু সুইডেনের একজন শিল্পী ও ভারতীয় ভাস্কর্যের বিশেষজ্ঞ এলিস বোনার (১৮৮৯-১৯৮১) তার *প্রিন্সিপালস অফ কম্পোজিশন ইন হিন্দু স্কাল্পচারস: কেইভ টেম্পল পিরিয়ড* (১৯৬২) গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন স্থানের ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই অঞ্চলের ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিদ্যমান। (নিজার, ২০১৭, পৃ. ৬৪-৬৫)। আমাদের প্রশ্ন হলো, যদি যৌক্তিকভাবে ধরে নেয়া যায় ভাস্কর্যের প্রয়োজনে হলেও খসড়া চিত্র রচিত হয়েছে, তবে এই খসড়া চিত্রগুলো কি আমরা পাচ্ছি? পাই না, কিন্তু স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি খাটিয়েই আমরা জানি যে, এটি রচিত হয়েছিল। কাজেই চিত্রকলার প্রমাণগুলোতে সরাসরি চিত্রেরূপে হাজির থাকা সবসময় বাধ্যতামূলক নয়। এর উপস্থিত থাকার প্রমাণ ভাস্কর্যের উপস্থিতি। চিত্রকলার সরাসরি উপস্থিতির অপ্রতুলতায় বাইরে সাহিত্যিক প্রমাণের উপস্থিতিতো আছেই। বাংলার চিত্রকলার প্রমাণীকরণের ইউরোপীয় ধারণাকে বদলে দিলে দেখা যাবে, সর্বত্রই এর সরব এবং প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি রয়েছে।

তাছাড়া বৌদ্ধ-জৈন-আজীবিক ধর্মের জন্ম, প্রচার ও প্রসার বাংলা এবং এর সন্নিহিত অঞ্চলেই প্রাধান্য লাভ করেছিল। বাঙালির যে মৌলক তান্ত্রিক প্রবণতা এর উৎপত্তিও বাংলা অঞ্চলে। তন্ত্রের মূল কথা হলো 'যা আছে দেহ ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। তান্ত্রিক বাঙালির শিল্প-দর্শন-সাহিত্য কোনকিছুই একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন নয়। জীবন-জগৎ বিষয়ে একটি সার্বিক একাত্মতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তন্ত্রের প্রধানতম বিষয়। বাঙালির চিত্রকলা তাই দেহকেন্দ্রিক, দেহকে কেন্দ্রে রেখেই অন্যান্য বিষয়কে অনুধাবনের পদ্ধতি বাঙালির একান্ত মৌলিক প্রবণতা। বাংলার চিত্রকলায় দেখা যায় মানব-শরীর সবসময়ই অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াবলির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আঁকা হচ্ছে। আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি সাধারণত চিত্রিত মানবদেহের পরিবেশগত আবশ্যিক উপকরণ হিসেবে অঙ্কিত (চিত্র নং-২)।

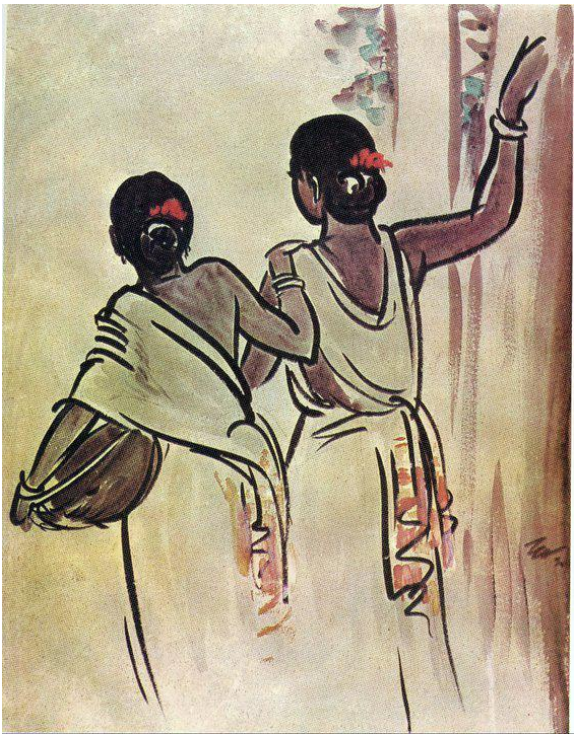

চিত্র নং-২। শিল্পী: জয়নুল আবেদিন

বাঙালি দেহকেন্দ্রিক হয়েও ইউরোপের মতো শরীরসর্বস্ব নয়। বাংলা তথা ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে আবৃত করে দেখা; যুক্তিবিরোধী হিসেবে প্রতিপন্ন করে তাকে পশ্চাৎপদ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতার প্রধান কারণ বাংলার ধর্ম-দর্শন-জীবনযাপন সম্পর্কিত অজ্ঞতা। বঙ্গীয় অঞ্চলে প্রাচীন যুক্তিবাদিতার ইতিহাস এবং শাস্ত্রসমূহ এখনো এখানকার মানুষের যৌক্তিক ভাবনার সাক্ষ্য বহন করছে। যুক্তিবিদ্যা নিয়ে আদি গ্রন্থসমূহ হলো, *কথাভাথু*, *চরক* এবং *ন্যায়সূত্র*। এসব গ্রন্থের আলোচনা-সমালোচনা, টীকা-ভাষ্যেরও রয়েছে বিস্তৃত উদাহরণ। প্রাচীনতম তান্ত্রিক বিশ্বাসে মানবদেহের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্য কিছুই হতে পারে না, দেহকে কেন্দ্রে রেখে তার চিন্তার বিষয়াবলী সাম্প্রতিককালে আধ্যাত্মিকতায় আছন্ন মনে হলেও মূলত বিষয়গুলো তৎকালীন বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত। পরবর্তী বিভিন্ন বাস্তব কারণে তন্ত্র ও বিজ্ঞানের ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হওয়ার কারণ অনেক বেশি রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক। বাঙালির দেহ আত্মার অধিষ্ঠানকেন্দ্র। তাই বাঙালি চিত্রশিল্পী মানবদেহকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েই ছবি এঁকেছে। চেতনে অবচেতনে পরবর্তী বাঙালি শিল্পীদের ভেতরেও এই প্রবণতা কাজ করেনি এমন কথা দৃঢ়ভাবে বলা যাবে না। কেননা আমরা বর্তমান বাংলাদেশের দিকপাল শিল্পীদের কাজেও একই লক্ষণ চিহ্নিত করতে পারি। যেমন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সবচেয়ে বিখ্যাত দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায়ও একইভাবে মানুষের শরীরকেই শুধু চিত্রায়িত হতে দেখি (চিত্র নং-৩)।

চিত্র নং-৩। শিল্পী: জয়নুল আবেদিন

তাঁর অন্যান্য চিত্রকর্মেও অধিকাংশই মানব-শরীরের প্রাধান্য। তাছাড়া শিল্পী কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮), শিল্পী এস. এম সুলতান (১৯২৩-১৯৯৪), এমনকি সমসাময়িক বিশ্বখ্যাত শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ (জ. ১৯৫০); যারা বাংলাকে ধারণ করেন, বাংলাকে বুকের ভিতরে লালন করেন তাদের অন্তরাত্মায় বাংলার চিত্রকলা বহমান আছে, তিনি জানুন অথবা নাই জানুন। দেহ এবং আত্মার একই সাথে চিত্রায়ণের পদ্ধতি বাংলার চিত্রকলার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য (চিত্র নং-৪)।

চিত্র নং-৪। শিল্পী: কামরুল হাসান

বাংলার চিত্রশৈলীর প্রাচীন ধারায় দেখা যায়:

> মূর্তির মাংসল শরীর, প্রায় গোলাকার মুখমণ্ডল, ঈষৎ ফোলা গাল, বড় বড় ভাবময় চোখ; অঙ্গে নানা অলঙ্কার; গায়ে সুন্দর বস্ত্রাদির ঈঙ্গিত, বসনের ভাঁজ সূক্ষ্ম রেখায় চিহ্নিত। মূর্তিগুলি নানা ভঙ্গিতে দাঁড়ানো বা বসা; দেহ ছন্দময় রেখায় আবদ্ধ। অনেক মূর্তির প্রায় স্বচ্ছ বসনের তলায় নগ্ন দেহের তরঙ্গায়িত রেখা। (মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৯, পৃ. ২২)।

পরবর্তীকালে ইউরোপীয় চিত্রধারার প্রভাবে মানব-অবয়বের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেলেও ক্যানভাস জুড়ে ঠিকই রাজত্ব করে যাচ্ছে মানব-শরীর। বাংলার গুণী শিল্পী এস এম সুলতানের ক্যানভাসেও আমরা একইভাবে চিত্রায়িত হতে দেখি মানবদেহের বিবিধ ভঙ্গির উপস্থাপন (চিত্র নং-৫)।

চিত্র নং-৫। শিল্পী: এস এম সুলতান

বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণকারী খ্যাতনামা শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদকেও আমরা একই ঘরানার অনুসারি হিসেবে পাই তাঁর বর্ণিল চিত্রভুবনে। তাঁর ক্যানভাসকে ছিঁড়ে-ফুড়ে বের হয়ে আসে মানুষ। মানবদেহই তাঁর আরাধ্য, 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ পাওয়া'র যে বাণী বাংলার দিগন্ত প্রসারিত শ্যামলিমাকে প্রতিনিয়ত আরো মানবিক করে তুলছে সেই মানুষ বাংলার শিল্পীদের ক্যানভাসকে কখনো ছেড়ে যায়নি (চিত্র নং-৬)।

চিত্র নং-৬। শিল্পী: শাহাবুদ্দিন আহমেদ

বাংলাকে অন্তরে লালনকারী শিল্পীদের যতই ইউরোপীয় ধারায় প্রশিক্ষণ হোক না কেন, তিনি তার আত্মার আহ্বানকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করতে পারেন না। দেহ-সাধনের প্রাচীন ইতিহাসের যে ধারা চলমান ছিল তা এখনো বিভিন্ন ঝড়-ঝাপ্টা পেড়িয়ে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েনি। দেহের তরঙ্গ আর ছন্দায়িত রূপে বাঙালি শিল্পীর ধ্যান এখনো ভঙ্গ হয়নি। নানা প্রকরণ-উপায়ে সে ঠিকই চলমান রেখেছে তার রক্ত-কণিকায় মিশে যাওয়া স্বভাব। বাঙালি শিল্পী তাই প্রাধান্য দিয়েছে দেহভিত্তিক রেখার গুণাগুণকে। বাংলার চিত্রকলা রেখাপ্রধান। এই রেখা এবং চিত্রের গঠনপ্রণালী নিয়ে তার আছে বিস্তর অভিজ্ঞান। (চিত্র নং-৭)। রেখার জটিল বিন্যাসকে বিভিন্ন বর্ণের আলতো ছোঁয়ায় বাঙালি শিল্পী তার সাধনায় রূপায়িত করেছেন। এমন রেখাপূর্ণ চিত্রের নমুনা পাওয়া যাবে বিভিন্ন প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিত্রচর্চায়। নীহাররঞ্জন রায়ের বর্ণনায় যেমন পাওয়া যায়:

> মধ্যযুগচিহ্নিত রেখানির্ভর চিত্র-পরিকল্পনা যে-তিনটি তাম্রপট্টোৎকীর্ণ রেখাচিত্রে পূর্ণ-পরিণতরূপে দৃষ্টিগোচর, তাহার একটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন আচার্য কুমারস্বামী তাঁহার Portfolio of Indian Art-গ্রন্থে; ইহার প্রতিচিত্রও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার তারিখ আনুমানিক একাদশ শতক। দ্বিতীয়টি রাজা ডোম্বনপালের সুন্দরবন-

পট্টোলীর পশ্চাদপটে উৎকীর্ণ। তৃতীয়টি চট্টগ্রাম জেলার মেহার গ্রামে প্রাপ্ত দেববংশীয় জনৈক রাজার পট্টোলীর উপরিভাগে উৎকীর্ণ। শেষোক্ত দুইটিরই তারিখ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক এবং দুইটিই অধুনা আশুতোষ-চিত্রশালায় রক্ষিত। উভয় চিত্রেই তীক্ষ্ণ রেখার দ্রুত রূপায়ণ, এবং সে রূপায়ণে সজীব প্রবাহমানতা অব্যহত; অবিচ্ছিন্ন গতিও অক্ষুণ্ন। তবে, বেশ বুঝা যায়, যেখানেই সামান্য সুযোগও পাইয়াছেন শিল্পী সেইখানেই চঞ্চল বঙ্কিম রেখাপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, অকিঞ্চিতকর বিষয়বস্তুতেও এমন একটা অহেতুক প্রাণময়তা ও রেখাপ্রাচুর্য পরিস্ফুট বিষয়বস্তুর সঙ্গে যাহার কোনও সঙ্গতি দেখা যায় না। বস্তুত, এই রেখা পরিকল্পনা কোনও গভীর উপলব্ধি বা প্রেরণা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয় না। সম্ভবত, এই অস্বাভাবিক ও সঙ্গতিহীন প্রাচুর্য ও প্রাণময়তার ফলেই পার্শ্ব হইতে খচিত অর্ধাকৃতি অথবা ত্রি-চতুর্থাংশ চিত্রিত মুখমণ্ডলের রেখা চঞ্চুবৎ সুতীক্ষ্ণ নাসিকায় অথবা কৌণিক চিবুকে, তীক্ষ্ণ ধনুকাকৃতি ভ্রু অথবা দীর্ঘায়ত বঙ্কিম ঊর্ধ্বোষ্ঠে পরিণতি লাভ করিয়াছে। মনে হয়, শিল্পী যেন তীক্ষ্ণ দ্রুত রেখার বিলাসে প্রায় আত্মবিস্মৃত হয়ে হইয়া গিয়াছেন, কারণ রঙের মণ্ডণায়িত রূপায়ণ যেখানে নাই সেখানে শিল্পীর হাতে রেখাই বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। চঞ্চল ও দীর্ঘায়ত বঙ্কিম রেখাসৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যে এমন কামনা প্রত্যক্ষ। এমন কি প্রতিমার সম্মুখভঙ্গি চিত্রণের সময়ও মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণ রেখানির্ভর করিয়াই আঁকা হইয়াছে এবং শিল্পী যেখানেই তীক্ষ্ণ ভাব সঞ্চারের অবকাশ পাইয়াছেন সেখানেই রেখাগুলিতে ভীষণ চাঞ্চল্য ও পুনরাবৃত্তি দেখা দিয়াছে। (রায়, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭২)

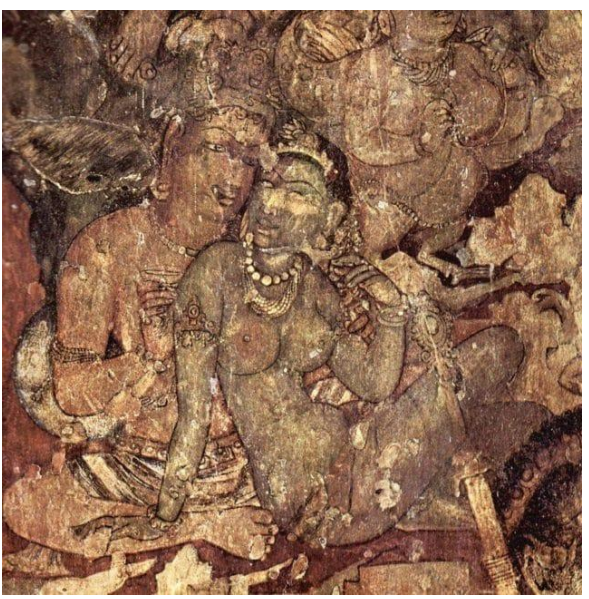

চিত্র নং-৭। অজন্তা ম্যুরাল

রেখার চাঞ্চল্য ও বিবিধ গতি-প্রকৃতি বাংলার চিত্র রচনার ধারাকে দিয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। চিত্রকলার বিধি-বিধানের বিষয়ে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে রয়েছে বিস্তারিত করণ-কৌশল ও পদ্ধতি বিষয়ক অনুপুঙ্খ আলোচনা। এসব আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে চিত্রকলা এখানে শুধুই পরম্পরাগত কোনো বিষয় ছিল না। পদ্ধতি ও করণকৌশল বিষয়ে নিশ্চয় গুরুগৃহ হোক অথবা কোন তৎকালীন ধারণা অনুযায়ী কোন বিদ্যায়তনেই হোক– দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপার ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের পণ্ডিতমহল আমাদের চিত্রকলাকে পরম্পরাগত চিত্রধারা বলে মূলত এর প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থিতিকেই অস্বীকার করছেন। লোকচিত্র বলে একটা ঘরানাকে সামনে এনে তাকে শুধুই বংশ পরম্পরায় প্রবহমান বিষয় বলে যেভাবে অস্বীকৃতির অন্ধকারে একটি সমৃদ্ধ চিত্র প্রকরণকে গোপন করে ফেলা হচ্ছে, তা বাঙালি মননে বিদেশি কুমন্ত্রণা বলেই ধরে নেয়া যায়:

> কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু, তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলাদেশ জুড়ে খাল কাটা হয়েছিল আশ্চর্য নৈপুণ্যে; হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বুদ্ধিতায় সে-সমস্তই বন্ধ হয়ে গেছে বলেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জ্বলছে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগুলোও গেল বন্ধ হয়ে, আর অন্তর-বাহিরের সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠেছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমাধান হয়েছিল, আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্বসঞ্চয় কিছু বাকি আছে, তাই এখনো দেখতে পাচ্ছি নে এর মরামূর্তি। (ঠাকুর, ২০১২, পৃ. ১১৩)

বাংলা অঞ্চলে শিক্ষা দেয়া নেয়ার বিষয়গুলো দীর্ঘকাল ধরেই চর্চার বিষয়। টোল, পাঠশালা, গুরুগৃহ ইত্যাদির থেকে শুরু করে বর্তমান কালের ধারণা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছিল শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত। চিত্রকলা বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ, নিয়মাবলি, মাপজোখ, পরিমিতি, বর্ণ-পদ্ধতির সবই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগুলোতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাওয়া যাচ্ছে। সরসীকুমার সরস্বতীর *পালযুগের চিত্রকলা* থেকে উদ্ধৃত করা যায়:

> কোন চিত্রকলার আলোচনায় চিত্রাঙ্কন-বিধি সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হবে। চিত্রাঙ্কন একটি দুরূহ বিদ্যা, আর তার প্রক্রিয়াদিও বেশ জটিল–সাধারণের আয়ত্বের বাইরে। [...] সৌভাগ্যের বিষয় কয়েকখানি শিল্প-গ্রন্থে চিত্রাঙ্কন প্রণালী সম্পর্কে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। [...] তার মধ্যে একটি শিল্প-গ্রন্থ, নাম 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধার'। একাদশ শতকের এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়ে চিত্রকর্ম সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় একসপ্ততিতম অধ্যায়ে গ্রন্থকার চিত্রকর্মের আটটি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন। শ্লোকটিতে কিছু ভ্রান্তি দেখা যায়, বিচ্যুতিও আছে। তৎসত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট শ্লোকটির অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধার কঠিন নয়। 'অঙ্গ' এই সংজ্ঞাটি গ্রন্থকার চিত্রকর্মের আঙ্গিকের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অর্থে ব্যবহার করেছেন বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁর মতে চিত্রকর্ম আটটি অঙ্গে বিভক্ত। (১) বর্তিকা, (২) ভূমিবন্ধন, (৩) লেখ্য ও (৪) রেখাকর্ম, (৫) বর্ণকর্ম, (৬) বর্তনাক্রম, (৭) লেখন বা লেখকরণ, (৮) দ্বিককর্ম (?)। এই আটটি অঙ্গ সমষ্টিগতভাবে চিত্রকর্মের

আঙ্গিক নির্দেশ করে। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে' চিত্রের আটটি গুণের (গুণাষ্টক) উল্লেখ করা হয়েছে। 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারের' অষ্টাঙ্গ পৃথক পর্যায়ের–এগুলি সবই আঙ্গিক সম্পর্কীয় চিত্র-প্রস্তুতির প্রক্রিয়া বিশেষ। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরের' 'গুণাষ্টক' চিত্রবিচারের ক্ষেত্রে অপরিহার্য গুণ বিশেষ।

আরও দুখানি শিল্প-গ্রন্থ চিত্রকর্মের আঙ্গিকের আলোচনায় বিশেষ তথ্যপূর্ণ। একটি হচ্ছে 'অভিলাষিতার্থ চিন্তামনি' বা 'মানসোল্লাস'। [...] আর একখানি 'শিল্পরত্ন'। [...] এই দুই গ্রন্থে 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' বর্ণিত চিত্রকর্মের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক পরিপূরক তথ্য পাওয়া যায়। [...] পালযুগের পুঁথিতেও অনুরূপ আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছিল এ অনুমান হয়তো অসঙ্গত নয়। (সরস্বতী, ১৯৭৮, পৃ. ৯৬-৯৯)। (চিত্র নং-৮)

চিত্র নং-৮। পালযুগের পুঁথিচিত্র

দেখা যাচ্ছে প্রাচীন গ্রন্থাবলির সাক্ষ্য প্রচলিত 'লোকচিত্র'কে বাংলার চিত্ররূপ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। কেননা এসব নিয়মাবলি এবং বিধি-বিধান খুবই সুনির্দিষ্ট। আমাদের রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ চিত্রবিদ্যা ও অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি যেমন, চিত্রকলা সম্পর্কিত *চিত্রলক্ষণ*, *চিত্রসূত্র*, *নারদশিল্প*, *বিষ্ণুধর্মোত্তর*, *শিল্পরত্ন*, *প্রজাপতিশিল্প* ছাড়াও চিত্রকলার নিয়মাবলি ও করণ-কৌশল বিষয়ক প্রাচীন পুঁথি-পুস্তক। তাছাড়া অলংকারশাস্ত্র বা নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাবলিও পর্যাপ্ত, যেসব শাস্ত্রের নিরিখে রচিত হয়েছে চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটক। চিত্রকলায় এখানে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপার আছে। না জেনে, না বুঝে শুধু আবেগ তাড়িত হয়ে একই রকম ছবি আঁকতে থাকার ধরন বাংলার চিত্রকলার মূল ধারা নয়। গ্রামীণ, নিরক্ষর মানুষের সৃষ্টি 'বাংলার লোকচিত্র' হতে পারে; অন্তত 'বাংলার চিত্রকলা' নয়। বাঙালি অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

(১৮৬১-১৯৪১) চিত্রকলার দিকে দৃষ্টি ফেরালেও বিষয়টি অনেকখানি উপলব্ধি করা যায়। এক সময়ের কবিতার কাটাকুটি তথা রেখার জটাজাল থেকেই বেরিয়ে আসে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত চিত্র সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাচ্যজ্ঞানের সন্ততুল্য মানুষ। তিনি অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭১-১৯৫১) কিংবা নন্দলাল বসুকে (১৮৮৩-১৯৬৬) মুখে অনেক বলেও যা বোঝাতে পারেননি তাই তিনি চিত্রকলায় করে দেখিয়েছেন। তাঁর চিত্রকলায় রেখার বিস্তৃতি, গতিময়তা এবং চাঞ্চল্যকর ব্যবহার বাংলা পরম্পরারই অঙ্গীভূত (চিত্র নং-৯):

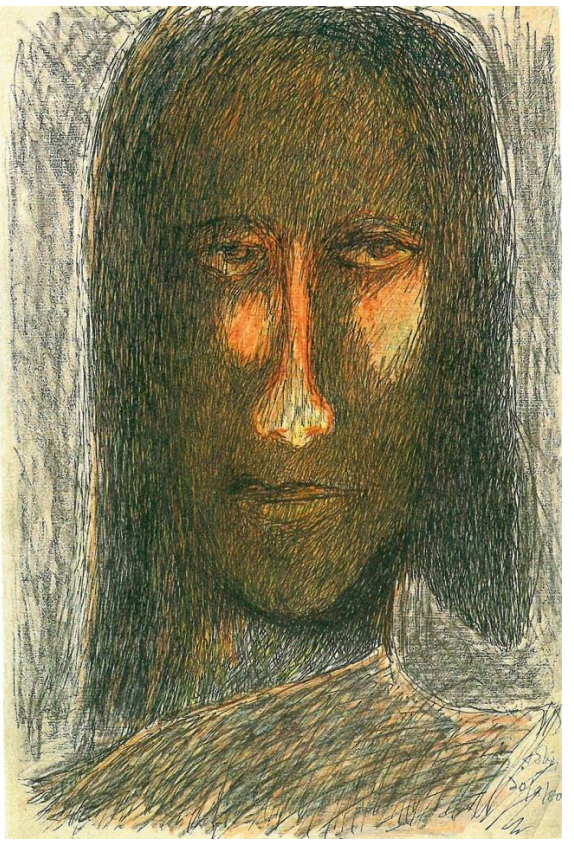

চিত্র নং-৯। শিল্পী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিষ্ণুধর্মোত্তরে–এ লিখিত আছে:

রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্যাঃ বর্তনাঞ্চবিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছতি বর্ণঢ্যমিতরে জনাঃ।।

ইহার তাৎপর্য এই যে প্রাচীন আচার্যেরা রেখা সন্নিবেশ দ্বারা বস্তুর স্বাভাবিক আকারকে ফুটাইয়া তোলা প্রশংসার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা চাহিতেন তাহার প্রাণপ্রদ রূপ। কারদাসের মত পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে উভয়ের যেখানে সুসঙ্গত এবং সম্যক মিলন ঘটিত সেই চিত্রকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। (দাশগুপ্ত, ২০০৬, পৃ. ১২)

ইউরোপীয়ান চিত্রকলা থেকে বাংলা অঞ্চল তথা ভারতবর্ষে চিত্রকলার ধরন-চলন-দর্শন সবই একেবারে আলাদা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। এখানে চিত্রকলায় রেখার বিস্তার-ভঙ্গি-ধরন সবই স্বতন্ত্র ঘরানার। চিত্রকলায় দেহ ও আত্মার সম্মিলন ঘটেছে বাংলার চিত্রকলায় তাই এর বাহ্যিক আড়ম্বরের সাথে অন্তর্দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যও চিত্রিতরূপের অংশ। স্টেলা ক্রামরিশ (১৮৯৬-১৯৯৩) যেমন *বিষ্ণুধর্মোত্তরের* ভূমিকায় এই অঞ্চলের শিল্পকলা সম্পর্কে বলেন: "Imagination, observation and the expressive force of rhythm are meant by the legends of the origin of painting, to be its essential features." (Kramrisch, 1928, p. 10)। এখানে নারীকে কখনো চিত্রায়িত করা হয় না, চিত্রিত হয়েছে নারীত্বের মৌলিক রূপ। বাহ্যিক দেহবিন্যাসে যাকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় সার্বিক বোধের উপস্থিতিতে। কিন্তু উপনিবেশিক শাসনের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে আমরা ভুলতে বসেছি আমাদের নিজস্ব শিল্প-সমৃদ্ধির বয়ান:

> ই বি হ্যাভেলও বলেছিলেন যে ক্লাইভ থেকে মেকলে এ দেশের অধিবাসীকে এটা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে এ দেশের নিজস্ব কোন শিল্পপরম্পরা নেই। জর্জ বার্ডউড বলেছিলেন, Sculpture and painting are unknown as Fine Arts in India. এই নির্বৈধীকরণের ফলে শিক্ষিত মানসে আত্মসম্পদ বিষয়ে অজ্ঞানতা ও অবিশ্বাস থেকে হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির নিরিখকে একমাত্র মাপকাঠি মনে করা শুরু হয়েছিল। (সোম, ২০০৪, পৃ. ৭১)

নিজেদের সবকিছুকেই তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা শুরু হয়েছে আরো অনেক আগে থেকেই। যাচ্ছেতাই পন্থায় অনুকরণের প্রতিযোগিতায় আমরা নিজস্বতা হারিয়ে বর্বর, আগ্রাসী, অমানবিক সংস্কৃতিকে উন্নত মনে করে তার দিকেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বেড়াচ্ছি। কোন সভ্য সমাজই নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষের উপর আক্রমণকে, তার সম্পদ লুটে নেয়াকে অথবা তার স্বাধীনতাকে বিনা কারণে হরণ করাকে বৈধ বলে বিবেচনা করে না। অথচ বাঙলায় এসে যেন সভ্যতার সংজ্ঞাই বদলে গেল। আমরা দখলদার, আগ্রাসী, আক্রমণকারীদের সভ্য বলে গুণকীর্তন শুরু করলাম। বিষয়টি একদিনে সম্পন্ন হয়নি; এর পেছনেও রয়েছে বহিরাগত আগ্রাসী বর্বর মানুষের কূটচাল। তারা নানাবিধ ভয়ভীতি ও প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে সমাজের সুবিধাবাদী ভোগী শ্রেণিকে হাত করে বাকি জনগণের উপর জোর-জবরদস্তি খাটিয়ে শাসন ও নির্যাতনের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিল। স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে আইন-কানুন, ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি সব কিছু তাদের ধারালো নখের থাবায় ক্ষত-বিক্ষত হলো। তাই সমসাময়িককালে কেউ বাংলার ইতিহাস খুঁজতে গেলে কিছু রক্তের দাগ ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না। এই মনুষ্যত্বহীন পরধনলোভে লালায়িত একদল বহিরাগত বর্বরকে আমরা বিনা দ্বিধায় সভ্যতার উচু স্তরের মানুষ বলে মনে করছি।

> ঐ সভ্যতাভিমানী নাগরিকেরা নিজেদের পঙ্কশয্যাকেই বিলাস-শয্যা করিয়া–অতিশয় ধর্ম্মহীন ও সত্যহীন জীবন যাপন করিয়াও চীৎকার করিবে–'সব ঠিক আছে!'–বাঙালীর–অর্থাৎ তাহাদের ঐ গোষ্ঠীর–গৌরব কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই! আবার,

> যাহারা পশ্চিমা বণিকরাজের চরণামৃতপানে চরিতার্থ হইয়াছে, সেই শ্মশান-কুক্কুরদের আনন্দ-কোলাহল এখনই নিবৃত্ত হইবে না। বাংলার বড় বড় পত্রিকাধিকারিগণ–সেই বণিকরাজের রাজ-শ্যালক যাহারা, এবং যাহারা ব্যবসায়ের দ্বারা, অর্থৎ পয়সা লইয়া জনগণের চৈতন্য হরণ করে–তাহারাও স্বাধীন ভারতে বাঙালীর এই চরম দুর্গতির কথা ঘুণাক্ষরে বলিতে দিবে না। এই সুখসমৃদ্ধশালী নাগরিকেরা মনে করে, তাহারা বাঁচিলেই বাঙালী বাঁচিল; তাহাদের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে, তাহাতেই বাঙালী-জাতি ধন্য হইয়াছে। ইহারা কিছুতেই মৃত্যুর কথা বলিতে দিবে না। (মজুমদার, ২০০৮, পৃ. ৭)

বাঙালির মৃত্যুদশায় যারা নিজেদের দিকে ফিরে তাকানোর অবসর পায় না অথবা যারা বিভ্রান্তির জালে আবদ্ধ হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন তারা বাঙালি নন। হয়তো বহিরাগত সেই সব বর্বর জাতিরই কোন বর্ধিতাংশ। যাদের এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র কৌতুহল আছে এবং যারা তাদের দেশমাতৃকার দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ইতিহাসকে পুনরায় বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের যে সকল ছিন্নপত্র এখনো কুড়িয়ে পাওয়া যায় তার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে পূণর্গঠিত হতে পারে প্রকৃত ইতিহাস। স্বাধীন মানুষ হয়ে বাঁচার প্রয়োজনেই বাঙালির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলি আলাদা মনোযোগের দাবি রাখে। ইংরেজি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের রুচি-মনন ও বিবেচনা থেকে এখন বাংলা একেবারেই নির্বাসিত। শহুরে মানুষ 'লোকচিত্র' অভিধার মাধ্যমে বরং একটি চিত্র-প্রকরণের শরীরে পুনরাবৃত্তির রোগ সংক্রমিত করে তার সকল সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটিয়েছেন। এর প্রধান কারণ আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুনির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষিত এবং অন্যান্য বিষয়ে বিচরণ নেই এমন সার্টিফিকেটধারী মানুষের প্রায় পুরোটাই যান্ত্রিকভাবে পৃথিবীকে দেখতে শিখেছে। শিল্পকলা অথবা চিত্রকলা বিষয়েও একই অবস্থা, বরং অবস্থাটা আরো শোচনীয়। প্রথমত বাংলায় আলাদা করে চিত্রকলার কোন ঘরানা থাকতে পারে এই বিষয়ে তাদের ধারণা নেই, দ্বিতীয়ত যাদের ধারণা আছে তারাও মনে করেন তথাকথিত ফোক আর্ট বা লোকশিল্পই বাঙলার মূলধারার চিত্রকলা। লোকচিত্রকে যখন বাংলার চিত্রকলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তখন শিক্ষিত বাঙালির রুচিতে বাঁধে; কেননা সে এই শিল্পকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারে না। লোকশিল্পের ধরন-বৈচিত্র্যহীনতা, এর পরম্পরাগত চারিত্রিক স্থবিরতা শিল্পের মূল সৃজনশীল গতিময়তারই বিপরীত। তাই শিক্ষিতমানুষের মনে এর জন্য অনুগ্রহ অনুকম্পা জন্মে ঠিকই, কিন্তু ভালোবাসা জন্মে কদাচিৎ। এই দোষটি পুরোপুরি শিক্ষিতমহলের নয়, কারণ বিদগ্ধ রুচির নতুনত্বের আকাঙ্ক্ষা ও গতিময়তার সাথে লোকচিত্রের স্থানু চরিত্র ঠিক মেলে না, এমন কিছু চিত্রকর্মকে সামনে হাজির করে বলা হয় এটাই তোমার জন্মভূমি বাংলার বহুচর্বিত, বদ্ধ-জলাশয়ের মতো নিষ্প্রাণ চিত্রকলা। লোকশিল্পের এই সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এখানে সৃজনশীল রুচির মানুষের সিদ্ধান্তও অযথার্থ নয়, কেননা সৃজনশীলতাবর্জিত একধরনের চক্রাকার প্রকরণই লোকচিত্র নামে অভিহিত হচ্ছে। বর্তমানে লোকশিল্প আদতেই গ্রামীণ পশ্চাদপদ শিল্পশিক্ষাহীন মানুষের দ্বারা দৈনন্দিন বস্তুগত প্রয়োজনের নিরিখে নির্মিত শিল্পকলা। দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো একেবারেই বাহ্যিক

এবং জীবনধারণের নিমিত্তে ব্যবহারের বিষয়। কিন্তু প্রকৃত চিত্রকলা অনেকটাই মানসিক উৎকর্ষের প্রয়োজনে তৈরি হয়। আত্মার খোরাকের প্রয়োজনে নির্মিত শিল্পকলা ঠিক লোকচিত্রকলা নয়, যদিও লোকচিত্রকলাও আত্মাকে সন্তুষ্ট করে তবু এর ঘাটতি রয়েছে, যা পূর্ণ করতে পারে বিদগ্ধ মানুষের রুচিসম্মত চিত্ররীতি– যা বাঙলার চিত্রকলার মূল সুর। বাংলার চিত্রকলায় ভাবের যে দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোকচিত্রকলায় তা একেবারেই অনুপস্থিত। অজন্তার শিল্পীগণ পার্সপেক্টিভ বা পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ছিলেন বিশেষজ্ঞ। এ্যানাটমি বিষয়ে অজন্তার শিল্পীদের ছিল টনটনে জ্ঞান। (মণ্ডল, ১৯৬৮, পৃ. ১৫৯)। লোকচিত্রের প্রায় সবটাই সাজসজ্জা ও অলংকরণধর্মী এবং অলংকারও তার প্রাথমিক দশা পেরোতে পারেনি। অথচ বাংলার মূলধারার চিত্রকলা অলংকরণের প্রয়োজনে নির্মিত নয়, বরং বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে যতটুকু দরকারি– ততটুকুই তার বিন্যাস। কেবল পুরুষানুক্রমে পরম্পরাই নয়। বৃহৎ বাংলা অঞ্চলে শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত তার প্রচুর সাক্ষ্য পাওয়া যায়, ই বি হ্যাভেলের মতে, "পাঞ্জাবের তক্ষশিলায়, বিহারের নালন্দায়, আর ওড়িষ্যার শ্রীধান্যকটকে অতি পুরাকালে চিত্রবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অমরাবতী, এলোরা, এলিফ্যান্টার চিত্রসম্ভার তারই ফল।" (মণ্ডল, ১৯৬৮, পৃ.২৬৪)। অথচ আমরা বাংলার চিত্রকলাকে চিহ্নিত করছি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থাকা এক নিখাদ আবেগ উচ্ছ্বাসের ফলাফল হিসেবে; যেখানে নিয়ম-কানুনের বালাই নাই, বুদ্ধি-বিবেচনা, যুক্তি-প্রযুক্তি বিবর্জিত এক আদিম প্রচেষ্টাকে আমরা দেখছি বাংলার শিল্পকলারূপে। ভারতীয় (বঙ্গীয়) চিত্রকলার ষড়ঙ্গে যে রূপভেদ-প্রমাণ-ভাব-লাবণ্য-সাদৃশ্য-বর্ণিকাভঙ্গের জ্ঞান, লোকচিত্রে তার অধিকাংশই অনুপস্থিত। লোকচিত্রে রূপের ভেদজ্ঞান কিংবা প্রমাজ্ঞানের কোন উপস্থিতি নেই, সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য প্রকট, লাবণ্যের পরিমিতি সাধারণত থাকে না, এমনকি বর্ণিকাভঙ্গও বৃত্তাবদ্ধ। তাই বাংলার চিত্রকলা বলে লোকচিত্রকে চিহ্নিত করা একটি অজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমাদের ইংরেজি-শিক্ষিতমহল লোকচিত্রকেই বাঙলার মূলধারা হিসেবে বর্ণনা করে মেকি প্রশংসায় ভাসিয়ে দিচ্ছেন। শিল্পসমালোচক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর যেমন লোকচিত্র সম্পর্কে বলেন:

> বিষয় সমগ্র জীবন, লোকচিত্র তারই প্রতীক। সম্পূর্ণ, দৈনন্দিন, নিশ্বাসের মতন; লোকচিত্রে জীবনের সমগ্র ডিজাইনের ভীড়, দৈনন্দিনের সহজতা অথচ নিশ্বাসের মতন দরকারী। সমগ্র ডিজাইন তৈরি হয় জীবনযাপন থেকে, দৈনন্দিন প্রয়োজন জীবন থেকেই বেড়ে ওঠে, লোকচিত্র নিঃশ্বাসের মতন অলক্ষ্যে কাজ করে। শরীরের ভিতরে, মননে, মানসে, রক্তে যে-মূল্য সমষ্টি ও ডিজাইন গড়ে ওঠে তারই প্রতীক লোকচিত্র। জীবনযাপনের ছাপ পড়ে দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রীর রূপে, গড়নে, রংয়ে, সেজন্য ব্যবহার্য সামগ্রী প্রয়োজনীয়, সেইসঙ্গে ব্যবহার্য রূপের মধ্যে আসে সংক্ষিপ্ত, ছিমছাম, সংযমী গড়ন, জাঁকালো অলংকারবিহীন, এভাবে প্রাত্যহিক জীবনে আসে আরাম, গড়নে আসে শ্রান্তিহীনতা, মনে ভরে দেয় আনন্দ, ঘরের সজ্জার মধ্যে নির্ভুলভাবে তৈরী করে

> প্রশান্তি। নিত্য ব্যবহার্য বলে লোকচিত্রের নির্মাণ প্রয়োজনীয়তার মাপে, সংযমী; বাহুল্যহীন বলে ফর্ম ও ডিজাইন সঠিক, যথাযথ। (জাহাঙ্গীর, ২০০৩, পৃ. ১১)

এসব প্রশংসাবাণী সাধারণ পাঠক-রসিকের জন্য অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এ সিদ্ধান্ত আমাদের ইংরেজি-শিক্ষিত মানুষের বিদেশি প্রভুদের শিখিয়ে দেয়া আদিখ্যেতার ফসল। তারা উপরে বসে বসে লোকশিল্পের কৃত্রিম গুণগান করবে, কিন্তু নিজেরা কেউ লোকশিল্পীর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। পৃথিবীর সকল দেশের সুফল ভোগ করার পর অবসরে নিজের দেশ ও জাতির কল্যাণে উচ্ছিষ্ট সময়ের ব্যয়িত অংশেই বসে আছে লোকচিত্র। ফলত বাংলার চিত্রধারা নিয়ে আলাদা অভিনিবেশের কোনো সুযোগ তাদের ঘটেনা, অপরের মুখস্ত করানো বুলিই আওড়াতে হয়।

বাংলার চিত্রকলাকে জাতির স্মৃতি থেকে প্রায় বিস্মৃত করে দেয়ার প্রকল্পটি একেবারেই শেষ পর্যায়ে রয়েছে। একটি অঞ্চলের পুরো শিল্পকলাকে এমন লোকশিল্প অভিধায় পশ্চাদপদতার মোড়কে ঢেকে দেয়ার কৃতিত্ব আছে ঔপনিবেশিক শক্তির। শিল্পের মূল ধারাকে ভুলিয়ে দিয়ে একটি অমার্জিত প্রকরণের সামনে আমাদের হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করা হলো বিভিন্ন কৌশলে। পক্ষান্তরে আমাদের শিল্পীবৃন্দ, রসিক মহল, সমালোচক-তাত্ত্বিকবৃন্দ পুরোটাই ইউরোপের অনুকরণে মত্ত রইলেন। অথচ আমাদের ইতিহাসের নানা স্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাংলার প্রকৃত চিত্রকলার ইতিহাস এবং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নমুনা। বাংলা অঞ্চলের শিল্পকলা বলতে লোকশিল্পকে চিহ্নিত করার কারণ কি? অথবা এর আগে কি অন্য কোন ধরনের চর্চা হয়েছে কিনা এসব বিষয়ে বিস্তর অনুসন্ধান দরকার। কেননা আমরা জানি বাংলা অঞ্চল প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই অনেক সমৃদ্ধ এবং শিক্ষিত অঞ্চল, পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলা অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল, যেসবে চিত্রকলা চর্চার ব্যবস্থা ছিল। "হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় অজন্তায় শিল্পকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হত। ...বলা যেতে পারে অজন্তাই পৃথিবীর প্রথম শিল্পশিক্ষার বিদ্যানিকেতন।" (নিজার, ২০১৭, পৃ. ৬০)। নালন্দার সমৃদ্ধ ইতিহাসও এখন সামনেই আছে, তাছাড়া পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ভিতরগড়, সোমপুর বিহার, বাংলার নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিদ্যায়তনের কথাও সুবিদিত। এই অঞ্চলের তথা বাংলার চিত্রকলা বলতে যদি প্রচলিত লোকচিত্র ঘরানার অশিক্ষিত, গ্রামীণ, পশ্চাদপদ মানুষের কাজকেই শুধু সামনে উপস্থিত করা হয়, তাহলে অনিবার্য এক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে যে, এই অঞ্চলের শিক্ষিত গ্রামীণ এবং শহুরে মানুষেরা কি চিত্রচর্চা করেনি? যদি করে থাকে তার নমুনা নাই কেন? নালন্দা, তক্ষশীলা, মহাস্থানগড়, সোমপুর, পাহাড়পুর, লালমাই, চন্দ্রকেতুগড়, মঙ্গলকোট, ভিতরগড় বিহারগুলোতে কি কোনো শিল্পচর্চা হয়নি? যদি হয়ে থাকে এসব চিত্রকলা কি বাংলার চিত্রকলা নয়? তাহলে বাংলার চিত্রকলা বলে এক ধরনের জমে যাওয়া, একই আবর্তে খাবি খাওয়া, পরিবর্তন-পরিমার্জনহীন, অপরিশীলিত চিত্রচর্চার ধারাকেই বাংলার চিত্রকলা বলে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও উপহাস-করুণার বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করলো কারা? আর আমরা যারা এসব বিষয়গুলো বিনা বিবেচনায় মেনে নিচ্ছি তাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির

ধারা কোন পথে প্রবহমান? কাজেই বাংলার চিত্রকলাকে তার স্বরূপে ফিরিয়ে আনার জন্য এর নাড়িনক্ষত্র তলিয়ে দেখা দরকার। দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৩৯) মতে 'বাঙ্গলাদেশই মগধের প্রধান চিত্র-শালা ছিল।' (সেন, ২০০৬, পৃ. ২৩৫)। তিনি বলেন:

> ভারতবর্ষে দেবদেবী, বহু হস্ত, বহু মুখ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সহকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিয়া ভাসাভাসা সমালোচনা করেন, তাঁহারা হয়ত মনে করিতে পারেন, এই শিল্প বিশৃঙ্খল– ইহার কোন সূত্র বা নিয়ম নাই, শিল্পী তাঁহার খেয়ালে কার্য্য করিয়া যান। কিন্তু শুক্রনীতি ও শিল্পসম্বন্ধীয় সমস্ত পুস্তকে কলাশিল্পের নিয়ন্ত্রণের যে সকল সূক্ষ্ম ও কঠোর নিয়ম আছে, তাহাতে শিল্পীর যথেচ্ছারের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। (সেন, ২০০৬, পৃ. ২৩৫)

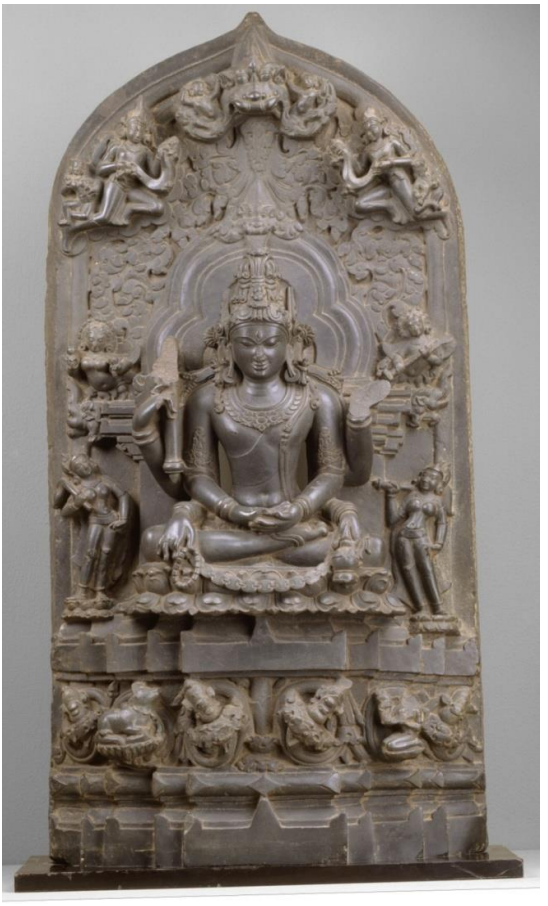

চিত্র নং-১০। পাথর কেটে নির্মিত ভাস্কর্য

কিন্তু লোকচিত্র নামক একটি ধারাকে অনেকটা মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে, এ হলো আমাদের আসল চিত্রধারা; এ ধারায় শিল্পীর শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন নেই,

প্রাণের তাগিদে, মনের খেয়ালে শিল্পী শুধু রচনাই করে যাবেন। এর কোন নিয়ম-সূত্র নেই, পরম্পরায় সৃষ্ট এক আশ্চর্য সৃষ্টি মহান এই শিল্প। লোকচিত্র বলে একটি চিত্রধারার সাথে প্রতারক রাজনীতিবিদের মতো আন্তরিক সম্ভাষণ ও ভালোবাসার ফুলঝুরি ছড়িয়ে, তাদের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মোটাতাজা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাঠ দখলে রাখা হচ্ছে। আর ক্রমান্বয়ে বাঙালির প্রকৃত চিত্রধারাকে ধ্রুপদী, অননুসরণীয়, দূরতম ঘরানা বলে এবং যুগের সাথে দীর্ঘ বিচ্ছেদ তৈরির মাধ্যমে ভুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। অথচ এই বাংলার চিত্রধারা সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র-প্রকরণকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়েছে বহুকাল ধরে:

> লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অসিত হালদার অজন্তা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'আশ্চর্য্যের বিষয় অজন্তার ছবির মধ্যে আমরা বাঙ্গালা দেশের প্রচুর আভাস পাই। প্রথমত আমরা গুহার নিকটবর্ত্তী দূরবর্ত্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটির দেখেছি, সবগুলিই মাটির ছাদ, অজন্তার ছবিতে অবিকল বাঙলার খড়ে ছাওয়া আটচালা। সে দেশের লোক নারকেল গাছ চোখে দেখেনি, কিন্তু ছবিতে নারকেল গাছ যথেষ্ট। (সেন, ২০০৬, পৃ. ৪১৬)

বাংলার চিত্র ধারার যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, অজন্তার চিত্রধারার সাথে তার মিল কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। বরং বিশেষজ্ঞদের অভিমত বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে বাংলার চিত্রকরগণই অজন্তার চিত্র রচনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলা অঞ্চলে যেসব চিত্রবিদ্যালয় ছিল তাদেরই শিল্পী-শিক্ষার্থীদের রচনা অজন্তার চিত্রমালা। এমন সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্যে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, এবং সেটি অত্যন্ত স্বাভাবিক কেননা আমরা দীর্ঘদিন থেকেই বাংলা বিষয়ক সকল ইতিহাসকেই চূড়ান্ত উল্টোভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে আছি। আমরা ইতিহাসকে যখন বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে থাকি তখনই এমন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। কিন্তু চিত্রকলাকে যদি আমরা সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম-দর্শন-অর্থনীতিসহ সার্বিক বিষয়াবলির প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে দেখতে পারি তাহলে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তমূলক বাক্যগুলিকে অযৌক্তিক মনে হবে না। এ প্রসঙ্গে শ্রী পঞ্চানন মণ্ডলের মতামত হলো:

> অজন্তার ছবির মধ্যে বাংলাদেশের দৃশ্যের সাদৃশ্য হুবহু। [...] পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূমে পুরানো পুঁথির কাঠের পাটার ওপর যে-সব ছবি আঁকা দেখা যায়, অজন্তার ছবির সঙ্গে তার টেকনিক, রং আর রেখায় অদ্ভুত মিল রয়েছে। এদেশে দুর্গা-প্রতিমার চাল-চিত্র এখন যে-ভাবে গোবর-মাটির জমির ওপর, পাতলা ন্যাকড়া জমিয়ে, সফেদার সাদা রং দিয়ে আঁকা হয়, অজন্তাতেও যেন সেই নিয়মই চলতো। কালীঘাটের পটের আর অজন্তার ছবির রেখার টানেও মিল রয়েছে। অজন্তার বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে তিব্বত, চীন, জাপানের বুদ্ধমূর্তির সাদৃশ্য বিস্ময়কর। এদেশ থেকেই সব ওদেশে গেছে –একথা ওকাকুরাও স্বীকার ক'রে গেছেন। (মণ্ডল, ১৯৬৮, পৃ. ১৬০)

বঙ্গভূমি শিল্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই। সকল বড় বড় ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী বৃহৎবঙ্গে থাকার কারণে এখান থেকে এর সকল সম্পদই ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। বিশেষত পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ার অসংখ্য প্রমাণ ইতিহাসের সর্বত্রই পাওয়া যায়।

আমাদের লোকচিত্রের ধারাটিও ধ্রুপদী ঘরানারই উপজাত করণ-কৌশল। যারা সঠিক পদ্ধতিতে এই ধারাটি আয়ত্ত করতে পারেনি কিন্তু ছবি আঁকার প্রবল বাসনা অন্তরে লালন করে তাদের দ্বারা সৃষ্ট এই লোকচিত্রের পরম্পরা। এদের শিক্ষাদীক্ষা নেই, গ্রামীণ পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী এ কথাগুলো পুরোপুরি সঠিক। তাই মার্জিত রুচির সাথে এদের যে দূরবর্তী অবস্থান তাও আমাদেরই বাস্তবতা। কেননা যারা শেখার সুযোগ পায়নি, তারা প্রাথমিক কিছু কৌশল এবং ভাবনারই প্রয়োগ ঘটায়, আর সে সবের সাথে আরো জটিল এবং বহুমুখী মানসের দূরত্ব থাকবেই; মিলও পাওয়া যাবে অনেক বেশি মাত্রায়:

> কালীঘাটের পটের ও অজন্তার রেখা-কৌশলের মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। কবির কথায় বলতে ইচ্ছে হয়
>
> আমাদেরই কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়।
>
> আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।।
>
> [...] অশোকস্তম্ভের উপর যে সিংহ মুখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাঙলাদেশে চিত্রকর ও কুমারদের মধ্যে বহুকাল প্রচলিত ছিল। [...] দূর অজন্তাগুহা এবং মাগধী শিল্পের ধারা বঙ্গদেশে এখনও চলিয়া আসিতেছে। সেই সকল প্রাচীন শিল্পকলার এত বেশী নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে যে বাঙলায় আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচীন শিল্পের জন্মভূমি বলিয়া মনে করিতে আমাদের মনে কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধাভাব হয় না। (সেন, ২০০৬, পৃ. ৪১৮)

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা অঞ্চল ছিল চিন্তা-চেতনা ও বিদ্যাবুদ্ধির মূল উৎস ভূমি, যা পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে। বাইরের শক্তিগুলো ইতিহাসের প্রায় সর্বসময়েই বাংলায় এসে হোঁচট খেয়েছে। বাংলায় এসে ধর্মগুলো তাদের রূপ বদলে নিয়েছে তান্ত্রিকতায় আর রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিতে হয়েছে বিবিধ কূটকৌশল। ইতিহাসের এসব উপকরণের ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি অজন্তার ছবির মূল উৎসভূমিও বাংলা অঞ্চল। ইতিহাসে এর বহুবিধ প্রমাণ এখনো সংরক্ষিত আছে। অজন্তার চিত্রকলার মূল প্রেরণা যে বৌদ্ধ ধর্ম তার আদি উৎসও বৃহৎবঙ্গ:

> চিত্রগত অনুপ্রেরণা ছাড়াও অজন্তার ছবির পেছনে আছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রেরণা। এই সব ছবিতে বুদ্ধের কাহিনী, জাতকের গল্প একটা প্রধান স্থান নিয়েছে। [...] কোথাও বাস্তবের মাছিমারা নকল ঘটেনি। অথচ সবই যেন বাস্তব হয়ে উঠেছে এবং রূপের বৈচিত্র্যে ও অজস্রতায় যেন বান ডাকিয়ে তুলেছে। কিন্তু উপকরণ অতি সামন্য, রঙ ও রেখার সংযম অসামান্য।... অজন্তার চিত্রশিল্প যে প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তা-ই নয়, অনেকেই আছেন যাঁরা ওরিয়েন্টাল আর্ট বলতে অজন্তার আর্টকেই বোঝেন। (রায়, ১৯৯৬, পৃ. ২৭-৩১)

বাংলা অঞ্চলের শিল্প, মানস ও শৌর্য সমৃদ্ধিকে অস্বীকার করার একটা ধারা ঐতিহাসিকভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কেননা বাংলায় অধিকাংশ আক্রমণকারীই প্রথম অবস্থায় খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারেনি। সুতরাং তাদেরকে নানা অপবাদে জর্জরিত করে মানসিকভাবে আঘাতের একটা প্রকল্প প্রচলিত ছিল সুদীর্ঘকাল ধরেই। দূরদেশ থেকে

আগত ভিন্ন মত ও পথের মানুষেরা বাংলায় বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে নানারকমভাবেই। প্রধান বাঁধাটাই ছিল চিন্তা-চেতনা ও সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের। পরিব্রাজক, পর্যটক অথবা বণিকদের বাঙালি দিয়েছে আতিথেয়তা, কিন্তু আগত অতিথি যখনই কোনো নতুন মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে– বাঙালি তাকে রুখে দাঁড়িয়েছে, আর কুড়িয়েছে বেশ কিছু বদনাম:

> দীর্ঘদিন ধরে বিহারের গণ্ডক নদীকে সভ্যতা ও বর্বরতার বিভাজন রেখা হিসেবেই ধরা হত। এবং আর্যরা ওই এলাকা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে লেখা হয়েছিল, সরস্বতী নদীর পাড় থেকে সদানীর নদীর পাড় পর্যন্ত পুরোহিত রহুগুনার সঙ্গে আগুন বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন 'বিদেহা মাধব'। তারপর থেকে ব্রাহ্মণরা আর ওই নদী পেরয়নি, কারণ আগুন সেখানে যায় না। [...] বাংলায় ভ্রমণ করে কেউ জাত খোয়াতে চাইত না। কেননা বাংলায় ভ্রমণ করে জাত যেত। এই উল্লেখ পাওয়া যায় আদি ও স্কন্ধ পুরাণে। পুণ্ড্রদের বলা হত দস্যু, বা অন্ত্যজ দস্যু। একই সঙ্গে অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ, মুতিভদেরও উল্লেখ করা হত ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত অর্ধশত সন্তান হিসেবে। (দাশগুপ্ত, ২০০৯, পৃ. ৩০)

বহিরাগত আর্যশক্তি থেকে শুরু করে সর্বশেষ ইংরেজ পর্যন্ত সকলেই বাংলার মানসিক মেরুদণ্ড গুড়িয়ে দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের সেই সব বিকৃতিই পরবর্তী প্রজন্মের বাঙালিরা ধীরে ধীরে সত্য বলে মনে করতে থাকে; ফলত সমসাময়িককালেও বাংলা বিশেষ কোন সমৃদ্ধি অথবা গৌরবের ঘটনা সামনে এলে অধিকাংশ বাঙালি ভ্রু কুঁচকে তাকায়; তাদের বাঙালি বিষয়ে যে কোন ভাল জিনিসকেই সন্দেহ করার মানসিক বিকার তৈরি হয়েছে, বিপরীতপক্ষে যে কোনো খারাপ বিষয়ের সাথে বাঙালি নিজের নাম সানন্দে জড়িয়ে দিতে পারে। এমনকি বাঙালির কল্যাণে যারা নিবেদিত প্রাণ তাদেরও কাউকে কাউকে দেখা যায় বাঙালিকে তাচ্ছিল্য ভরে ভর্ৎসনা করতে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁর *আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প* প্রবন্ধে অনেকটা খেদের সুরেই লিখেছেন:

> বাঙালী নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্রসংগ্রহ দেখিলে বোধ হয় যে, অনুকরণ–স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে–নচেৎ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল-মন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ্য হইলেই হইল, সন্নিবেশনের পরিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল। ভাস্কর্য্য চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙালীর উত্তমাধম বিচারশক্তি দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান–প্রভেদ অতি অল্প। নৃত্য গীত–সে সকল বুঝি বাংলা হইতে উঠিয়া গেল। সৌন্দর্য্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনসুখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই। (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৪)

এসব কথা ঔপনিবেশিক বাঙালির ক্ষেত্রে যথেষ্টই মানানসই। বঙ্কিমের আক্ষেপ এবং ক্ষোভের বাস্তব ভিত্তিও সেই বাঙালি মানস। প্রকৃত বাঙালি মানুষের সাথে এসবের দূরতম কোন যোগ নেই। কিন্তু তিনি যে গভীর হতাশা থেকে এমন উচ্চারণ করেছেন অথবা উনিশ শতকীয় সাহেবী মেজাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাঙালির উপরতলার সুবিধাবাদী মহল সব সময়েই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন; মোসাহেবি, চাটুকারিতা, অনুকরণে ছিলেন ভীষণ পটু। সুবিধাবাদের মৌল ধর্মই সুবিধা আদায়ের সকল কৌশল অবলম্বন; নীতি-নৈতিকতা অথবা বিবেক-বিবেচনার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। একটা শ্রেণির এই মনোবিকারের সাথে জড়িত আছে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। আর্য আক্রমণকারীরাই এই বিকৃতির সূত্রপাত করে। অন্যান্যরাও আসেন তাদের পিছু পিছু।

> দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন মাসিডোনিয়ার সেকান্দর শাহ, ইংরেজি পাঠকদের আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছে তার আর এগুনো সম্ভব হলো না। তার শিবিরে খবর পৌঁছলো, পূবে প্রাসিয়াই বলে এক দেশ আছে, আর সেই দেশের পূর্বে গঙ্গারিডি বলে আর একটা দেশ আছে। গঙ্গারিডির রণহস্তির জন্য কোনো রাজা সেই দেশ জয় করতে পারেননি। (রহমান, ২০১৬, পৃ. ৭)

কিন্তু সব আক্রমণকারীই এক রকম ছিলেন না, অনেকেই শক্তিমত্তায় পিছিয়ে থাকলেও কূটকৌশলের বিচিত্র জালে বাংলাকে করায়ত্ত করেছেন। লুটেরাদের টার্গেটে পরিণত হওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল এই বাংলার। তার সম্পদ-সমৃদ্ধি এক প্রকার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজের অস্তিত্বের পক্ষেই। শিল্প-দর্শন-সাহিত্যের সমৃদ্ধি নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিলনা, তাদের প্রধান লক্ষ্যই এই অঞ্চলের সম্পদে ভাগ বসানো। শিল্পকারখানা সাথে শিল্পকলায়ও বাংলার সমৃদ্ধ ইতিহাস আমরা জানি। চিত্রকলার সমৃদ্ধির বিষয়েও অনেক বিদেশির মুগ্ধতা চোখে পড়ার মতো। অনেক ভিনদেশি বোদ্ধাও আমাদের প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যা আমাদের অনেক বাঙালি বোদ্ধার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে:

> "ষ্টেলা ক্র্যামরিশ রূপম পত্রিকায় (নং ৪০, ১০৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন :– The art of Bihar and Bengal exercised a lasting influence on that of Nepal, Burma, Ceylon and Java. (বাংলা ও বিহারের শিল্প নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও জাভার শিল্পের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল)।" (সেন, ২০০৬, পৃ. ৪০৭)

বাংলার চিত্রকলার সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো বাংলাতেই তার ঠাঁই হলো না। এখানে লোকশিল্প নামের এক জমাট-প্রাচীন-বদ্ধ শিল্পকলাকে প্রশংসা করে করে এমন একটা অবস্থায় আনা হলো যে আমরা বাংলার প্রকৃত শিল্পকলাকে শনাক্তই করতে পারছি না। অথচ নেপাল, শ্রীলংকা, তিব্বত, চিন, জাপান, ইন্দোনেশিয়ায় বাংলার শিল্পকলা ছদ্মনামে টিকে থাকলো। বাংলা থেকে বিতাড়িত অনেকটা বৌদ্ধ ধর্মের মতোই তার আশ্রয় হলো পাহাড়, জঙ্গল ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথ ১০৬৮ সালে *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়:

> During the time of king Devapala and Sri Dharmapala, there lived a highly skilled artist called Dhiman in the Varendra region. His son was called Bitpalo. These two followed the tradition of the Naga artists and practised various techniques like those of metal-casting, engraving and

> painting. The tradition of the technique of the father became different from that of the son. The son used to live in Bhamgala. The cast-images made by the followers of both of them were called the eastern icons, wherever these followers might have been born. (Chattopadhyaya, 1990, p. 348).

লোকচিত্রকে বাংলার চিত্রকলা বলে চিহ্নিত করলে ইতিহাসের প্রতি চূড়ান্ত অবিচার হয়। অবশ্য ইতিহাসেরও অধিকাংশই এই বিভ্রমের জালে আটকে থাকা গালগল্পপ্রধান। প্রাচ্যদেশীয় চিত্রকলা বলে যে চিত্রধারাটি এখনো ক্ষীণকায় দেহে প্রবহমান রয়েছে, সেখানেও বাংলার চিত্রধারার কিছু ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে। যদিও প্রাচ্যদেশীয় শব্দের যে ব্যাপ্তি তাতে করে বাংলাই সেখান থেকে হারিয়ে যাওয়ার আশংকা তৈরি হয়। যদি বাংলার শিল্পী ও তাত্ত্বিকমহল সঠিকভাবে একে সত্যায়িত করার ব্যর্থতা প্রদর্শন করেন, তাহলে কোনকালেই আমাদের ইউরোপের দাসত্ববৃত্তি থেকে মুক্তি মেলার সম্ভাবনা নাই। বাংলার চিত্রকলার আরো একটি দুর্ভাগ্য হলো, যদি এই চিত্রধারা সম্পর্কে বাঙালি মানস আরো আগে থেকেই সচেতন থাকতো–তাহলে বাংলার চিত্রকলা এতো শত বছরে আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতো। বাংলা অঞ্চলের অগণিত শিল্পী তার চলার পথে সহায়ক শক্তির আঁধার হিসেবে কাজ করতো, যারা এখন উল্টো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছেন। মূলধারার চিত্রকলা প্রতিস্থাপিত হয়েছে ইউরোপীয় চিত্রধারার মাধ্যমে। আর অপেক্ষাকৃত নিচুদরের একটি শিল্প, যা মূলধারার একটি ক্ষীণ প্রবহমান শাখা, অথচ চিহ্নিত হয়ে আসছে প্রধান স্রোত হিসেবে। ডব্লিউ. জি. আর্চার (১৯০৭-১৯৭৯) তার 'কালীঘাটের চিত্রকলা' নামক নিবন্ধে লিখেছেন:

> ছবিগুলি প্রমিত ছন্দে বিধৃত। এই সাবলীল দক্ষতাই ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে কালীঘাট পেন্টিংকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছিল। ধরে ধরে আঁকা নয় বরং দ্রুত হাতে টানা রেখা, অনেক কিছু বাদ দেয়ার সাহস, তথা সাহসী সরলীকরণ –এই ছিল বৈশিষ্ট্য। [...] কালীঘাট পেন্টিং এমনই এক ধারা ব্যবহার করত যা পরবর্তীকালে আধুনিক ফরাসী চিত্রকর লেগে (Leger) ব্যবহার করেছেন, এবং এদের উৎকর্ষ কখনও কখনও মাতিসের (Matisse) ছন্দোময় ঔজ্জ্বল্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ... বিশুদ্ধ শিল্পকলার নিরিখে, এগুলি ছিল স্থূল রুচির চরম নিদর্শন; যদিও তীর্থযাত্রীরা এগুলি পছন্দ করত। (আর্চার, ২০১৩, পৃ. ২৫৮)

ছন্দময় রেখা আর বাহুল্যবর্জিত চিত্রপটে বাঙালি চিত্রিত করেছে তার দৈনন্দিন জীবনালেখ্য। আর্চারের এই লেখায় প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বিধৃত আছে। এবং তিনি শেষ বাক্যে যে স্থূল রুচির নিদর্শন বলেছেন, তাও প্রণিধানযোগ্য। কালীঘাটের চিত্রকলার মূল্যায়নে তিনি যথার্থ বিবেচকের পরিচয় দিয়েছেন।

বর্তমানে বাংলার চিত্রকলাকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে প্রথম বাঁধা আসবে ইউরোপীয় প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় শিক্ষিত শিল্পীমহলের তরফ থেকেই। যারা হওয়ার কথা ছিল সহায়ক শক্তি, তারাই হবেন প্রধান প্রতিপক্ষ। কারণ তাদের মাথায় মন্ত্রের মতো গেঁথে আছে লোকচিত্র, যা আমাদের কীর্তি তো বটেই; তবে শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয় নিশ্চয়ই। শ্রেষ্ঠকীর্তিকে আড়ালে ফেলে আমরা যখন পার্শ্বচরিত্র নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রয়েছি, তখন আমাদের পশ্চাৎপদতার বদনাম ঘোচানোর কোন দেবদূত কোথা থেকে আসবে:

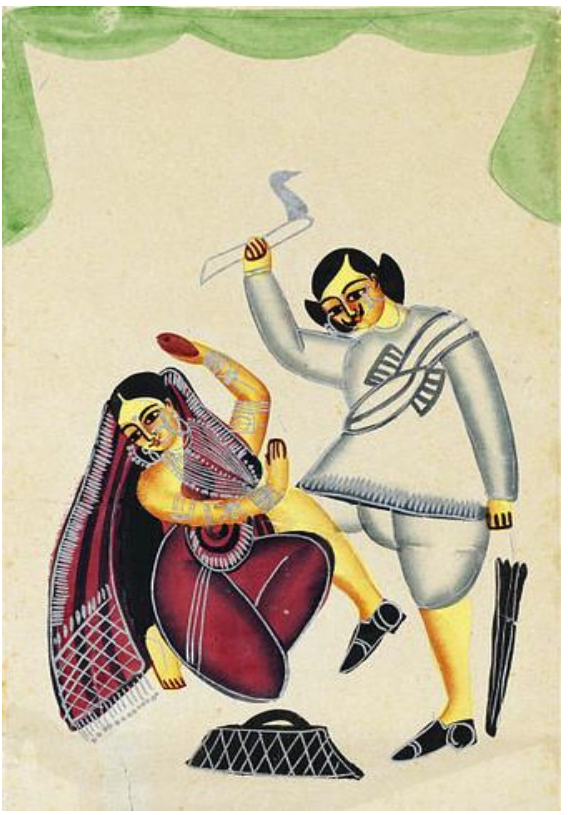

চিত্র নং-১১। কালীঘাট চিত্র: নবীন কিল'স এলোকেশী

> ১৯১১ সালে বিখ্যাত ইংরেজ চিত্র সমালোচক রজার ফ্রাই প্রাচ্যদেশীয় চিত্রকলা সম্পর্কে এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন–একবার যদি বিদগ্ধ-সমাজ প্রাচ্য চারুকলার শ্রেষ্ঠ কীর্তির সংযম, উপকরণের মিতব্যয়, তাদের অনির্বচনীয়, চরম গুণে অভ্যস্ত হন, তাহলে আশা করা যায় তাঁরা আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রকলার দিকে ফিরেও তাকাতে চাইবেন না। (মিত্র, ২০০৮, পৃ. ২৩)

এখনো আমরা ফিরে তাকাচ্ছি না বাংলার চিত্রকলার দিকে, কারণ লোকশিল্পের যে সকল উদাহরণ বাংলার চিত্রকলা হিসেবে পরিচিত আছে তার দিকে আসলেই ফিরে তাকানো দায়। কাজেই আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে লোকশিল্পের উৎপত্তি ও এই ঔপনিবেশিক

কূটচালের দিকে। কিন্তু ফিরে তাকানোর বিষয়েও আমরা কতখানি পরনির্ভরশীল তার বর্ণনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষ্য থেকে:

> মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপে খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশ-হিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখ-দুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীর রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম। এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহ বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ব-বিধাতার চক্ষে ধুলো দিবার আয়োজন করিতে হয়। (ঠাকুর, ২০১২, পৃ.২৩)

আমরা শুধু নিজেদের চোখেই ধুলা দিয়ে ক্ষান্ত হইনি। বিধাতার চোখেও ধুলা দেয়ার আয়োজন করেছি। দেশীয় চিত্রধারার নামে কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমে আমরা একটি সমৃদ্ধ চিত্রধারাকে একেবারে বিলীন করে দেয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছি। দেশীয় ধারাকে, দেশের ভাবকে ভুলে গিয়ে বিদেশিদের শিখিয়ে দেয়া একটি স্থূল রুচির প্রকরণকে মূল ধারার বিকল্প হিসেবে দাঁড় করাতে তাত্ত্বিক জায়গা থেকে যত শ্রম, সময় ও নিষ্ঠা ব্যয় করছি, তার কিছু অংশ যদি এর ব্যবহারিক দিকে ব্যয়িত হতো তাহলে বাংলার চিত্রকলা বলতে আমাদের আর লোকচিত্রকে বুঝতে হতো না। লোকচিত্রকলা নিঃসন্দেহে বাংলার চিত্রকলা, তবে অবশ্যই তা বাংলার চিত্রকলার মূলধারা নয়। মূলধারার বাংলার চিত্রকলাকে তার যথার্থ স্থানে স্থাপন করতে না পারলে 'বাংলার চিত্রকলা' নামক ধোঁয়াশা থেকেই যাবে, যার পরিণামে আমাদের শিল্পী ও রসিকবৃন্দ আরো বেশি পরিমাণে ইউরোপের অনুসারী হতে থাকবে। ফলে অজ্ঞতার তিমিরে হারিয়ে যেতে থাকবে বাংলার এক অমূল্য মেধাগত সম্পদের উত্তরাধিকার।

তথ্যসূত্র

আর্চার, ডব্লিউ. জি. (২০১৩)। "কালীঘাটের চিত্রকলা", *বাঙলার লোকসংস্কৃতি* (বরুণকুমার চক্রবর্তী ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সম্পা.)। অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র (১৩৬১)। "আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প", *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), (যোগেশচন্দ্র বাগল, সম্পা.)। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান (২০০৩)। *বাংলাদেশের লোকশিল্প*। আইসিবিএস, ঢাকা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১২)। "শিক্ষার বিকিরণ", *রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র* (শোয়াইব জিবরান, সম্পা.)। সংবেদ, ঢাকা।

দত্ত, গুরুসদয় (২০০৮)। *বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য*। ছাতিম বুক্স্, কলকাতা।

দাশগুপ্ত, বিপ্লব (২০০৯)। *বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ (২০০৬)। *ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা*। চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা।

নিজার, সৈয়দ (২০১৭)। *ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা*। চৈতন্য, সিলেট।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি (১৩২২)। *পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী*, ২য় খণ্ড। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস (১৪১৬)। *বাঙ্গালার ইতিহাস*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ (২০০৯)। "শাক্তধর্ম ও তন্ত্র", *বাংলার ধর্ম ও দর্শন* (রায়হান রাইন, সম্পা.)। সংবেদ, ঢাকা।

মজুমদার, মোহিতলাল (২০০৮)। *বাঙলা ও বাঙালী*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

মণ্ডল, পঞ্চানন (১৯৬৮)। *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, প্রথম খণ্ড। রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, বোলপুর, বীরভূম।

মিত্র, অশোক (২০০৮)। *ভারতের চিত্রকলা*, প্রথম খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ (১৯৯৯)। *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প*। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (২০১৬)। *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রায়, নীহাররঞ্জন (১৪১৬)। *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

রায়, সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পা.) (১৯৯৬)। *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ*। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

শরীফ, আহমদ (২০০৮)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

সরকার, যতীন (২০১০)। *প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন*। শোভা প্রকাশ, ঢাকা।

সরস্বতী, সরসীকুমার (১৯৭৮)। *পালযুগের চিত্রকলা*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সুর, অতুল (১৯৮৬)। *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*। সাহিত্যলোক, কলকাতা।

সেন, দীনেশচন্দ্র (২০০৬)। *বৃহৎ বঙ্গ*, প্রথম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সোম, শোভন (২০০৪)। *শিল্প সংস্কৃতি সমাজ*। মনচাষা, উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ।

হারারি, ইয়ুভাল নোয়াহ (২০১৯)। স্যাপিয়েন্স, *মানবজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (সৈয়দ ফায়জ আহমেদ ও প্রত্যাশা প্রাচুর্য, অনু.)। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

Chattopadhyaya, Debiprasad (Ed.) (1990). *Taranath's History of Buddhism in India*. Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. Delhi.

Kramrisch, Stella (1928). *The Vishnudharottara (Part III) A. Treatise on Indian Painting and Image-Making*. Calcutta University Press, Calcutta.

Virgil, (2009). *Georgics.* (Peter Fallon, Trans.) Oxford World Classics Paperback. London.

চিত্রসূচি:

চিত্র নং-১। অজন্তার দেয়ালচিত্র

চিত্র নং-২। শিল্পী : জয়নুল আবেদিন

চিত্র নং-৩। শিল্পী : জয়নুল আবেদিন

চিত্র নং-৪। শিল্পী : কামরুল হাসান

চিত্র নং-৫। শিল্পী : এস এম সুলতান

চিত্র নং-৬। শিল্পী : শাহাবুদ্দিন আহমেদ

চিত্র নং-৭। অজন্তা ম্যুরাল

চিত্র নং-৮। পালযুগের পুঁথিচিত্র

চিত্র নং-৯। শিল্পী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র নং-১০। পাথর কেটে নির্মিত ভাস্কর্য

চিত্র নং-১১। কালীঘাট চিত্র : নবীন কিল'স এলোকেশী